বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত ছোট গল্প

প্রথম খণ্ড

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আলোকিত মানুষ চাই

বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত ছোটগলপ

প্রথম খণ্ড

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি
ঢাকা
৬৭৫২২৭

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ জুন ১৯৯০

তৃতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪০৫ জুলাই ১৯৯৮

প্রকাশক
কামাল হোসাইন
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২, ৮৬৮৫৬৭

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্পিউটার বিভাগ,

মুদ্রণ
আল-বারাকা এন্টারপ্রাইজ
১১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
ইউসুফ হাসান

মূল্য
সত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0013-6

বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলোকে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের পাঠক সাধারণের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্য 'বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত ছোটগল্প' শিরোনামে একটি সঙ্কলন আমরা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে যে-সব লেখকের গল্প সঙ্কলিত হয়েছে তাঁরা হলেন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–১৯৭৪)।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সূচি

দুরাশা ৯
অভাগীর স্বর্গ ২০
ডাইনি ২৮
প্রাগৈতিহাসিক ৪১
আমরা তিনজন ৫২

দুরাশা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিন্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুজ্‌ঝটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয় পর্বত–সুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম — অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভালো লাগে না, শব্দস্পর্শরূপময়ী বিচিত্রা ধরণীমাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের সকরুণ রোদনগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসংকুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে, অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ, কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের একমাত্র রোদনের মতো আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম গৈরিকবসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার চূড়া–আকারে আবদ্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যশোকের বিলাপ নহে, বহুদিনসঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নির্জনতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর–গড়া গল্পের মতো আরম্ভ হইল; পর্বতশৃঙ্গে সন্ন্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখনও চর্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিনকালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি, তোমার কী হইয়াছে?"

প্রথমে উত্তর দিল না, মেঘের মধ্য হইতে সজলদীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভয় করিয়ো না। আমি ভদ্রলোক।"

শুনিয়া সে হাসিয়া খাস হিন্দুস্থানীতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয়ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জাশরমও নাই। বাবুজি, একসময় আমি যে জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ

বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।"

প্রথমটা একটু রাগ হইল; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবি। কিন্তু এই হতভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন। ভাবিলাম, এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি। অবশেষে কৌতূহল জয়লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী।"

বদ্রাওন কোন্ মুল্লুকে এবং নবাব গোলামকাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কী দুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে দার্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না, কিন্তু ভাবিলাম রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ করো, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগুলি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্বে কস্মিনকালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্টকণ্ঠে দক্ষিণহস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে।"

দেখিলাম, রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিক্ত শৈবালাচ্ছন্ন কঠিনবন্ধুর শিলাখণ্ডতলে আসন গ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলামকাদের খাঁর পুত্রী নুরউন্নিসা বা মেহেরউন্নিসা বা নূর-উল্‌মুলক আমাকে দার্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদূরবর্তী অনতি-উচ্চ পজিকল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিন্টশ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নের আগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মতো শুনিতে হয়, পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্ঝরপ্রপাতধ্বনি এবং কালিদাস-রচিত মেঘদূত-কুমারসম্ভবের বিচিত্র সংগীতমর্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বুট এবং ম্যাকিন্টশ পরিয়া ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে কর্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একত্র উপবেশন-পূর্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অনুভব করিতে পারে এমন নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সেদিন ঘনঘোর বাষ্পে দশ দিক আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষুলজ্জা রাখিবার কোনো বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি—এক নববিকশিত বাঙালি সাহেব—দুইজনে দুইখানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুইখণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম, এই বিসদৃশ সম্মিলনের পরম পরিহাস কেবল

আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারও দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল।"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, "কে এ-সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এতবড়ো প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে।"

আমি কোনোরূপ দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম; কহিলাম, "তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে! আমরা তো কীটমাত্র।"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোনো স্থানের কোনো নবাবপুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন-ইচ্ছাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যদি ফমায়েস করেন তো বলি।"

আমি শশব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "বিলক্ষণ! ফরমায়েস কিসের। যদি অনুগ্রহ করেন তো শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে।"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এমনিভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিয়াছিলাম, বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্বরের মতো সোজা সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না; বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লির সম্রাটবংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল, পিতা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত সরকার-বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্ত্রীকণ্ঠে, বিশেষ সম্ভ্রান্ত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানী কখনও শুনি নাই, শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা—এ যেদিনের ভাষা সেদিন আর নাই, আজ রেলোয়ে-টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব নিরলংকার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘনকুজ্‌ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগলসম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিত লাগিল —শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মস্‌লিনের প্রচুরপ্রসর

জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরীর জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সংগীত যেন একেবারে এক মুহূর্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া-চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম, কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জোড়করে উর্ধ্বমুখে নবোদিত সূর্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্তবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজনগান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।'

আমি মুসলমানবালিকা ছিলাম কিন্তু কখনও স্বধর্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্মসংগত উপাসনাবিধিও জানিতাম না; তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপুরের প্রমোদভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধকরি স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন। অথবা আর-কোনো নিগূঢ় কারণ ছিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নির্জন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের পূজার্চনাদৃশ্যে আমার সদ্যসুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধুর্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনু দেহখানি ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত; ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমানদুহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত, দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্ম-পার্বণ উপলক্ষে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া বলিতাম, 'তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত, 'কেশরলালঠাকুর কাহারও অন্নগ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।'

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোরূপ ভক্তিচিহ্ন দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্বপুরুষের কেহ-একজন একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম, এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্যসম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্য কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম, শুনিয়া

সেই অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দুজগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইত। মূর্তিপ্রতিমূর্তি, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম, অগুরুচন্দনমিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগীসন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্রলীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি পুরাতন, অতি বিস্তীর্ণ, অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত, আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দুসংসার আমার বালিকাহৃদয়ের নিকট একটি পরমরমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানিবাহাদুরের সহিত সিপাহিলোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দুস্থানে হিন্দুমুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো-একটি বিশেষ কুটুম্ব-সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, "উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না, আমি কোম্পানি-বাহাদুরের সহিত লড়িব না।'

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দুমুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মতো সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, 'নবাবসাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন, তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।'

পিতা বলিলেন, 'সে-সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।'

কেশরলাল কহিলেন, 'ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।'

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না; কহিলেন, 'যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতকিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ এবং পুরাতন তলোয়ারগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে জিলার কমিশনার সাহেব লালকুর্তি গোরা লইয়া আকাশে ধূলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমাদের পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহ-সংবাদ দিয়াছিলেন।

বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল যে, তাঁহার কথায় তাহারা ভাঙা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারি হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মতো বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া একফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীরু ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারও দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধূলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চিৎকার এবং বন্দুকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল–আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, খুঁজিতে ছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল, সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনার তীরে আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম, সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে, রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুবিলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম, আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উদ্বেল হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল, এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম; শুনিলাম নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'জল'।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বামচক্ষু নষ্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনার জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর জল দিব?' কেশরলাল কহিলেন, 'কে তুমি।' আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'অধীনা আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁর কন্যা।' মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!'

এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন, আমি

মূর্ছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী, প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি, তখনও বহিরাকাশের লুব্ধ তপ্ত সূর্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই, সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে, আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।'

আমি নির্বাপিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহমুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া ছিলাম। গল্প শুনিতেছিলাম কি ভাষা শুনিতেছিলাম কি সংগীত শুনিতেছিলাম জানি না, আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, 'জানোয়ার।'

নবাবজাদী কহিলেন, 'কে জানোয়ার! জানোয়ার কি মৃত্যুযন্ত্রণার সময় মুখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে।'

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, 'তা বটে। সে দেবতা।'

নবাবজাদী কহিলেন, 'কিসের দেবতা! দেবতা কি ভক্তের একাগ্রচিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।'

আমি বলিলাম, 'তাও বটে।'

বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন, "প্রথমটা আমার বড়ো বিষম বাজিল। মনে হইল, বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম, হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাবদুহিতাকে ভূলুণ্ঠিতমস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কী মনে করিল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার মুখে বিস্ময় অথবা কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হস্ত প্রসারণ করিলাম, সে তাহা নীরবে প্রত্যাখ্যান করিল এবং বহু কষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়ানৌকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নৌকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খুলিয়া দিল, নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্যস্রোতে গিয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোকপুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে অকালবৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্ধ্বে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল; সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ

তিন ভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্যসুন্দর শান্তশীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বপ্নাভিহতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও-বা কাশবন, কোথাও-বা মরুবালুকা, কোথাও-বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথাও-বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।"

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদুহিতা কহিল, "ইহার পরে ঘটনাবলী বড়ো জটিল। সে কেমন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্‌টা ত্যাগ করিব, কোন্‌টা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কী উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়।

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য-অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাল্পনিক; একবার বাহির হইয়া পড়িলেই একটা চলিবার পথ থাকেই। সে পথ নবাবি পথ নহে, কিন্তু পথ; সে পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে—তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তাহা সুখেদুঃখে বাধাবিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাবদুহিতার সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না, হইলেও সে-সব কথা বলিবার উৎসাহ আমার নাই। এক কথায়, দুঃখকষ্ট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। আতসবাজির মতো যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ পুড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল না, আজ হঠাৎ সেই পরম দুঃখের, সেই চরম সুখের আলোকশিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছি—আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাপ্ত।"

এই বলিয়া নবাবপুত্রী থামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে তো কোনোমতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলাম, 'বেয়াদবি মাপ করিবেন, শেষ দিককার কথাটা আর-একটু খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।'

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম, আমার ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস হিন্দিতে বাৎ চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আব্রু।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোনোমতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই

বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাৎ কখনও পূর্বে, কখনও পশ্চিমে, কখনও ঈশানে, কখনও নৈঋতে, বজ্রপাতের মতো মুহূর্তের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়া, মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দস্বামীকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত, আমি ভক্তিভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মর্মান্তিক উদ্বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্তরশ্মিতে ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর হইতে যে-সকল বীরমূর্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল ।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে, তীর্থে তীর্থে, মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছি, কোথাও কেশরলালের কোনো সন্ধান পাই নাই। দুই-একজন যাহারা তাহার নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুদ্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাত্মা কহিল, 'কখনও নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই। সেই ব্রাহ্মণ, সেই দুঃসহ জ্বলদগ্নি কখনও নির্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনও কোনো দুর্গম নির্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।'

হিন্দুশাস্ত্রে আছে, জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে, মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে কথার কোনো উল্লেখ নাই, তাহার একমাত্র কারণ, তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম, কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে, কারণ তৎপূর্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তি লাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু সে কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি সেই-যে দেখিয়াছিলাম নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্তব্ধ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম, ব্রাহ্মণ নির্জন স্রোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনির্দেশ রহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে—তাহার কোনো সঙ্গী নাই, কোনো সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোনো আবশ্যক নাই, সেই নির্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ; আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম, কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে—ভুটিয়া লেপ্‌চাগণ ম্লেচ্ছ, ইহাদের আহার-ব্যবহারে আচার-বিচার নাই; ইহাদের দেবতা, ইহাদের পূজার্চনাবিধি সকলই স্বতন্ত্র; বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি, ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, আমার তরী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে।

তাহার পরে আর কী বলিব। শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়, সে কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কী ব্যাখ্যা করিব।

আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জিলিঙে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।"

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী দেখিলেন?"

নবাবপুত্রী কহিলেন, "দেখিলাম, বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়াপল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্রপৌত্রী লইয়া ম্লানবস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

গল্প শেষ হইল; আমি ভাবিলাম, একটা সান্ত্বনার কথা বলা আবশ্যক। কহিলাম, 'আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।'

নবাবকন্যা কহিলেন, "আমি কি তাহা বুঝি না। কিন্তু এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর-হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোলো বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগকম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর-এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নমস্কার বাবুজি!"

মুহূর্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল, "সেলাম বাবুসাহেব!" এই মুসলমান-অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না বলিতেই সে সেই হিমাদ্রিশিখরের ধূসর কুজ্‌ঝটিকারাশির মধ্যে মেঘের মতো মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিত্রিত দেখিতে লাগিলাম। মছলন্দের আসনে যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী নবাববালিকাকে দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভক্তিগদগদ একাগ্রমূর্তি দেখিলাম, তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছন্ন ভগ্ন হৃদয়ভারকাতর

নৈরাশ্যমূর্তিও দেখিলাম—একটি সুকুমার রমণীদেহে ব্রাহ্মণ-মুসলমানের রক্ততরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষজনিত বিচিত্র ব্যাকুল সংগীতধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দুভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্মল আকাশ ঝলমল করিতেছে, ঠেলাগাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ু-সেবনে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই-একটি বাঙালির গলাবন্ধবিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম, এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম—সেই মুসলমানব্রাহ্মণী, সেই বিপ্লবীর, সেই যমুনাতীরের কেল্লা কিছুই হয়তো সত্য নহে।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন । তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশী দল, চাকর বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুম-ধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দূর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ির দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছিয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড়-বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্ত মুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ-বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালির মা। সে তাহার কুটির-প্রাঙ্গণের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধূনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল; কাঙালির মা ছোট জাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বার বার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো--আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালির হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন ! সে ত সোজা কথা নয় ! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য-

প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালির মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে—মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিন্দূরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। ঊর্ধ্বদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালির মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চৌদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ্ দ্যাখ্ বাবা—বামুন মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্চে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্! ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখের জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নি মরেচে, তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা?

কাঙালির মার এতক্ষণে হুঁশ হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এইভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমনকি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে!—চোখে ধোঁ লেগেচে বই ত নয়!

হাঁঃ, ধোঁ লেগেছে বই ত না! তুই কাঁদতেছিলি।

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালিকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

দুই

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালির মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট কাঙাল-জীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালির মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ওই শিশুপুত্র কাঙালিকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালি বড় হইয়া আজ পনেরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালি পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি! কই দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালির মা কাঙালিকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মতো ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালি চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া-পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া-পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা ঠাকুরুন রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ না-কি আবার সগ্যে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালি, বামুন-মা, রথের ওপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে।

সবাই দেখলে?

সব্বাই দেখলে!

কাঙালি মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে, সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে তুইও তো মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল, ক্যাঙলার মার মতো সতী-লক্ষ্মী আর দুলে-পাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালির মা চুপ করিয়া রহিল, কাঙালি তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত নিকে করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বললি, ক্যাঙালি বাঁচলে আমার দুঃখু ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাব কিসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুতঃ সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই এবং যখন সে কিছুতেই রাজি হইল না, তখন উৎপাত উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালি মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালি, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালির খুব ভালো লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তাহলে দেবে না মা!

না দিক গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালি তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল তা হলে। রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ-সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা শুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালির স্বল্প দেহ বার বার করিয়া রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকার কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশান-যাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা-দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন! সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালি, সেই ত হরি। তার আকাশ-জোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত স্বর্গের রথ! কাঙালিচরণ, বাবা আমার!

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মতো আমিও সগ্যে যেতে পাব।

কাঙালি অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বলতে নেই।

মা সে-কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোট জাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না—দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্‌নে মা, বলিস্‌নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালি, তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালি? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

তিন

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্মৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি

সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালি গিয়া কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি অয়োজন; খল, মধু, আদার সত্ব, তুলসী পাতার রস—কাঙালির মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভালো হই ত এতেই হব, বাগ্‌দি-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই-তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টি-যোগ জানিত, হরিণের শিঙ্-ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হয় না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনিই ভালো হব।

কাঙালি কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলিনে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাব। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালি এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভালো করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরে জল পড়িয়া ধূঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণ কণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরল-ধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ি দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালির মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস্ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে—

কাঙালি বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালি বলিল, সে আসবে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্ বাবা, বলিস্, মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অমনি নাপ্‌তে-বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা

চেয়ে আনিস ক্যাঙালি, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালোবাসে।

ভালো তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

চার

পরদিন রসিক দুলে সময়মতো যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের' পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ-সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালি কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেচে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মতো তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ না-কি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে-স্ত্রীকে সে ভালোবাসা দেয় নাই, অশন-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজ-খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাখালের মা বলিল, এমন সতী-লক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা—ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালির বুকে গিয়া এ-কথা যেন তীরের মতো বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালির মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোটজাতের জন্যেও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি-না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ-দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কুটির-প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, এ-কি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেচিস্?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজি! বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে না-কি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে, বিনা

অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভালো হয় নাই। তাহারাই আবার দরওয়ানজির হাতে-পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালির মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত-মুখ নাড়িয়া জানাইল, এ-সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি-বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল এতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাংলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালি। দরওয়ানজি আমার বাবাকে মেরেচে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালি কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাট্‌তেছিল—আমার মা মরেচে,—বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকালবেলা এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না-কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নিচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবর-জল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালি সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালি বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেচে যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালি জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্য স্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল্‌গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালি বলিল, সে আমাদের উঠানের গাছ বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ!

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদার কর্মচারীরাই পারে।

কাঙালি ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন যে সে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ-চাকুরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ-ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েচে কি না। থাকে ত জালটাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়, হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যে-বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকি। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালি। মা বলে গেছেন তেনাকে আগুন দিতে।

তা দি গে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে,—না, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দি গে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড়ছেলে ব্যস্ত-সমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখেচেন ভট্চাযমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আবার কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালি আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালির হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালির মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালি ঊর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

ডাইনি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্তমান : ছাতি-ফাটার মাঠ! জলহীন, ছায়াশূন্য দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরটির একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অপরপ্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মতো মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া ওঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নাম-গৌরবে মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া ওঠে। ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মতো ধূলার একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; অপরপ্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের মসিরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর। শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূম-ধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ! ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় একহাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এতবড় প্রান্তরটায় এখানে-ওখানে কতকগুলি খৈরি ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোনো বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না; কোথাও জল নাই—গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।

মাঠখানির চারিদিকে ছোট ছোট পল্লি—সবই নিরক্ষর চাষিদের গ্রাম। সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহারা বলে, কোন্ অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমাণ পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরাপাতার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।

সে নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ! ভাগ্যদোষে ঐ বিষজর্জরতার উপরে আর-এক ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে 'দলদলির জলা' অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরনা-জাতীয় জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বছর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী—ভীষণ শক্তিশালিনী, নিষ্ঠুর, ক্রূর এক বৃদ্ধা ডাইনি। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে, তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে। তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির, আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে-ছাওয়া বারান্দা। সেই বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই-তিনটা বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা বেশি পরিমাণেই দিয়া থাকে; সেরখানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ি ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্ধেক বিক্রি করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ি ফিরিয়া আর-একবার বাহির হয় শুকনো গোবর ও দুই-চারিটা শুকনো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্তটা দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ি সে কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে এ কথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিন-চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটার মাঠের নির্জন রূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে! নির্জনতাই উহারা ভালোবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে অনিষ্টস্পৃহা জাগিয়া ওঠে! এ সর্বনাশী লোলুপ শক্তিটা সাপের মতো লকলকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া ওঠে! না হইলে সেও তো মানুষ!

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া ওঠে! বহুকালের পুরানো একখানি আয়না—সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয় হয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মতো একটা ঝকমকে ধার! জরা-কুঞ্চিত মুখ, শণের মতো শাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানার চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কী সুন্দর লালচে রঙ, আর কী পালিশই না ছিল! আর আয়নার কাচখানা ছিল রোদ-চকচকে পুকুরের জলের মতো। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কী পরিষ্কারই না দেখা যাইত! ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল—ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নিচেই টিকালো নাক; চোখ দুইটি ছোটই ছিল—চোখের তারা দুটিও খয়রা রঙেরই ছিল—লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত, কিন্তু তাহার বড় ভালো লাগিত; ছোট চোখদুটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকাইলে মনে হইত আকাশের কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়! অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল—নরুন দিয়া চেরা, ছুরির মতো চোখে, বিড়ালির মতো এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভালো লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না! কোথা দিয়া যে কী হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না; তবে হইয়া যায়।

প্রথম দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

বুড়োশিবতলার সম্মুখেই দুর্গাসায়রের বাঁধাঘাটের ভাঙা রানার উপর সে দাঁড়াইয়াছিল—জলের তলে তাহার ছবি উল্টাদিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জল স্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মতো দশ-এগার বৎসরের

মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ বামুন বাড়ির হারু চৌধুরী আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া শান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর তাহাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর সে এখনও শুনিতে পায়—হারামজাদী ডাইনি, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেলব হারামজাদীকে?

হারু সরকারের সে ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে।

সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল—ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল, তবে সে কথা বললি নে কেন হারামজাদী?

হ্যাঁ, লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা তো জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল!

হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট-বেদনায় ছটফট করছে।

সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়! কিন্তু এ-যে সত্য তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই! তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—সে হারু সরকারের বাড়ি গিয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়াছিল, আর বারবার মনে মনে বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, ভালো করে দাও, ওকে ভালো করে দাও! কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি, এই লইলাম! আশ্চর্যের কথা—কিছুক্ষণ পরেই বার-দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল, ওকে একটা আম আর দুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার-গিন্নি একটা ঝাঁটা তুলিয়াছিল, বলিয়াছিল, ছাই দেব হারামজাদীর মুখে; মা-বাপ মরা অনাথা মেয়ে বলে দয়া করি—যেদিন হারামজাদী আসে সেইদিনই আমি ওকে খেতে দি। আর কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়! আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে দেখ! ওর ঐ চোখের দৃষ্টি দেখে বরাবর আমার সন্দেহ ছিল—কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপুলেকে খেতে দিই নে। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি—আর ও কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কী দৃষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পলাইয়া গিয়াছিল। সেদিন সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ির দাওয়ায় শুইতে পারে নাই; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়োশিবতলায়। অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আর বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টি ভালো করে দাও, নাহয় আমাকে কানা করে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির মূর্তির মতো নিস্পন্দ বৃদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষণে ক্ষীণ একটা চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কী, আর সাধ্যই বা কী! বেশ মনে আছে—গৃহস্থের বাড়িতে সে আর ঢুকিবে না, কিছুতেই ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাহিত না, কোনও মতে বহুকষ্টে বলিত, দুটি ভিক্ষে পাই মা? হরিবোল!

কে রে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবি নে। খবরদার।

না মা! ঘরে ঢুকব না মা!

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে কী যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত, এখনও ওঠে! কী সুন্দর মাছভাজার গন্ধ, আহা-হা! বেশ খুব বড় পাকা-মাছের খানা বোধ হয়।

এই—এই! হারামজাদী, বেহায়া! উঁকি মারছে দেখ! সাপের মতো!

ছি ছি ছি! সত্যিই ত সে উঁকি মারিতেছে--রান্নাশালের সমস্ত আয়োজন তাহার নরুন-চেরা ক্ষুদ্র চোখের একদৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে! মুখের ভিতর জিভের তলা হইতে ঝরনার মতো জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ বিবর্ণ মাটির মূর্তি যেন কোথায় একটা নাড়া পাইয়া দুলিয়া উঠিল; ফাটলধরা শিথিলগ্রন্থি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসমগতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল, অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল—বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে কথা সারাজীবন ধরিয়াও বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়!

কিন্তু সে তার কী করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে—সে কী করিবে, কী করিতে পারে? প্রহৃত পশু যেমন মরিয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ-আঁ গর্জন করিয়া ওঠে, ঠিক তেমনি একটা ই-ই শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শণের মতো চুলগুলিকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে নরুন-চেরা চোখের চিলের মতো দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্র মাস, বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মতো কী একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে! একটা ফুৎকার যদি সে দেয়, তবে মাঠের ধুলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে।

ঐ ধোঁয়ার মধ্যে জমাট শাদার মতো ওটা কী? নড়িতেছে যেন! মানুষ? হ্যাঁ মানুষই তো! মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া ওঠে। ফুঁ দিয়া ধুলা উড়াইয়া দিবে মানুষটাকে? হি-হি-হি করিয়া পাগলের মতো হাসিয়া উঠিল। একটা অবোধ নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দুই হাতের মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—না না না। ছাতি-ফাটার মাঠে মানুষটা ধূলার গরমে শ্বাসরোধী ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

নাহ্—ওদিকে সে আর চাহিবেই না। তার চেয়ে বরং উঠানটায় আরও একবার ঝাঁটা বুলাইয়া ছড়াইয়া-পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলাকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙিয়া-পড়া দেহখানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল।

জড়ো-করা পাতাগুলো ফরফর করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে টানিয়া-আনা ধূলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়িকেই যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল, মুখে-চোখে ধূলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্রুত আবর্তিত পাতাগুলা তাহাকে যেন সর্বাঙ্গে প্রহার করিতেছে। জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জারীর মতো ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটাগাছটা আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো বেরো বেরো!

বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল। আবর্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধুলা হু-হু করিয়া উড়িয়া ধূলার একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে! শুধু কি একটা? এখানে-ওখানে ছোট-বড় কত ঘুরণ পাক উঠিয়া পড়িয়াছে—মাঠটা যেন নাচিতেছে! একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে! একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মতো অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে ন্যুব্জ দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমতো গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোনো অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তাহার ছিল না। ছোট শিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে!

কে রইছ গো ঘরে? ওগো!

জলে-পচা নরম মরা-ডালের মতোই বৃদ্ধ বাঁকিয়া-চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়া ছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনোমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল—কে?

ধূলিধূসর দেহ, শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ একটি যুবতী মেয়ে বুকের ভিতর কোনো একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধ হয় ছাতি-ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল, একটুকুন জল।

মাটির উপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল, মেয়েটির শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আহা-হা বাছারে! আয়, আয়! বোস!

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার একপাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল, একটুকুন জল দাও গো! মমতোয় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া একটুকরা পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল, আহা মা, এই রোদে ঐ রাক্ষুসী মাঠে কী বলে বের হলি তুই?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, আমার মায়ের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তু এসে পড়লাম একেবারে মধ্যিখানে।

জলের ঘটি ও পাটালির টুকরাটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল—মেয়েটির পাশে একটি শিশু! গরম জলে সিদ্ধ শাকের মতো শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল, দে দে বাছা, ছেলেটার চোখেমুখে জল দে! মেয়েটি ছেলের মুখে চোখে জল দিয়া আঁচল ভিজাইয়া সর্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলেটির দিকে চাহিয়া রহিল; স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মতো নরম, সরস। দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে!

এহ্, ছেলেটা কী ভীষণ ঘামিতেছে! দেহের সমস্ত জল কী বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখ দুটা লাল হইয়া উঠিয়াছে! তবে কি....? কিন্তু সে তাহার কী করিবে? কেন তাহার সম্মুখে আসিল? কেন আসিল? ঐ কোমল নধরদেহ শিশু ময়দার মতো ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া। জীর্ণ জরজর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত

শিহরন ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে! এহ, ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ! যা! নিতান্ত অসহায়ের মতো আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম! ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে! পালা পালা—তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি!

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢকঢক করিয়া জল খাইতেছিল—তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া পড়িয়া গেল; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ফারিত-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, এটা তবে রামনগর? তুমি সেই—? সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিণীর মতো ছুটিয়া পালাইয়া গেল।

কিন্তু সে কী করিবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন্ মুখে? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না—সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখেচোখে যে-কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে দেখিবে কী করিয়া? ছেলেমেয়েরা এমনিই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়াও ওঠে; আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধ হয় আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে। ছি ছি ছি!

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাত্রে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে তো অনেকটা ডাগর হইয়াছে! তাহার বয়সী তাহাদেরই স্বজাতীয়া সাবিত্রীর পূর্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছিল। ছেলেটি শুইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কী সুন্দর ছেলেটি!

ঠিক এমনিভাবেই—ঠিক এই আজিকার মতোই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া, নরম ময়দার তালের মতো ঠাসিয়া ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় চুষিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ি হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল—বলি ওলো— ও আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে ভাবী-সাবীর সঙ্গে মশকরা জুড়েছিস! আমার বাছার যদি কিছু হয় তবে তোকে বুঝব আমি —হ্যাঁ!

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল—বেরো বলছি বেরো! হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি!

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্বল শরীরে থরথর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের মধ্যে পালাইয়া গিয়াছিল। মর্মান্তিক দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। বার-বার সে মনে মনে বলিয়াছিল—ছি ছি! তাই নাকি সে পারে? হইলই বা সে ডাইনি,—কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে? ছি ছি! ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিয়াছিল—তুমি ইহার বিচার করিবে। একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে! দিয়া প্রমাণ করিয়া দিও সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালোবাসি।

কিন্তু অপরাহ্ণ বেলা হইতে-না-হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টিক্ষুধার কলঙ্ক অতি নিষ্ঠুরভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমনভাবে কাতরাইতেছে যে, ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের প্রান্তে শ্মশানের জঙ্গলের মধ্যে সন্তর্পণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল। বার-বার মুখের থুতু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল—কোথায় রক্ত! গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। প্রথম বার-দুয়েক বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার পরই কুটি কুটি রক্তের ছিটা, শেষকালে একেবারে খানিকটা তাজা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। সেইদিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাত্রে—সেদিন বোধ হয় চতুর্দশীই ছিল, হ্যাঁ চতুর্দশীই তো—বকুলের তারাদেবীতলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমায় আগের প্রতি চতুর্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে—মা, আমাকে ডাইনি হইতে মানুষ করে দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব। কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন যেন দুঃখে হতাশায় উদাস হইয়া গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মতো শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া কোন্ নিরুদ্দেশ-লোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারায় অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল—সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছাতি-ফাটার মাঠ ধূলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ; ধূসর ধূলার গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে সমস্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া হারাইয়া গিয়াছে।

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটি এ-গ্রাম হইতে খান-দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে। যে-ঘাম সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল সে-ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া দিল। কে আবার? ঐ সর্বনাশী! মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে—কেন গেলাম গো! আমি ঐ ডাইনির কাছে কেন গেলাম গো! আমি কী করলাম গো!

লোকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু-কামনা করিল। একবার জনকয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঐ ঝরনাটির কাছে আসিয়াও জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনি ক্রোধে সাপিনীর মতো ফুলিয়া উঠিল—সে তাহার কী করিবে। সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরস লাবণ্য কোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে এক সময় চিলের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণস্বরে। সেই চিৎকার শুনিয়া তাহারা পলাইয়া গেল। কিন্তু সে এখনও ক্রুদ্ধ অজগরীর মতো ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্‌গার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে! কখনও তাহার হি-হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চিৎকারে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিতে ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছা হইতেছে—বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা-হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই! এহ্, সে আজ একটা গোটা শিশুদেহের রস অদৃশ্য-শোষণে পান করিয়াছে!

ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। শুক্লা নবমীর চাঁদের জোছনায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা শাদা ফরাশের মতো পড়িয়া আছে। কোথায় একটা পাখি অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গে-ল! চোখ গে-ল! আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছনে ঝরনার ধারে দুইটা লোক যেন মৃদুগুঞ্জনে কথা কহিতেছে! আবার সেই ছেলেগুলো তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি? অতি সন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না, তাহারা নয়। এ বাউড়িদের সেই স্বামীপরিত্যক্তা উচ্ছলা মেয়েটা—আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাউড়ী ছেলেটা!

মেয়েটা বলিতেছে—না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘরে যাব।

ছেলেটা বলিল, হেঁ! এখানে আসছে নোকে; দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

—তা হোক! তোর বাবা যখন আমার সাথে তোর সাঙা দেবে না, তখন তোর সাথে এখানে কেনে থাকব আমি?

ছি ছি ছি! কী লজ্জা গো! কোথায় যাইবে সে! যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে—তবে মরিতে ওখানে কেন? তাহার এই বাড়িতে আসিল না কেন? তাহার মতো বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কী? কী বলিতেছে ছেলেটা?—বাবা-মা বিয়ে না দেয়, চল্ তোতে আমাতে ভিন্‌গাঁয়ে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব! তোকে নইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটির পছন্দের! ঐ কুপোর মতো মেয়েটাকে উহার এত ভালো লাগিল! তাহার মনে পড়িয়া গেল তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে লম্বা ছিপছিপে চৌদ্দ-পনর বছরের একটি মেয়ের ছবি! একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট! চোখদুটি ছোট—তারা দুটি খয়রা রঙের; কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বই কি! আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবিই দেখিতেছিল। তখন আয়না তো তাহার ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে তখনও কোনোদিন দেখে নাই। আরে, তুই আবার কেন রে? কোথা থেকে এলি?—লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবে বোলপুর আসিয়াছিল। সাবিত্রীর ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিয়া সেই চতুর্দশীর রাত্রেই গ্রাম ছাড়িয়া বোলপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটাকে দেখিয়া তাহার খারাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথার ঢংটা বড় খারাপ লাগিয়াছিল। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল—কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে, তোমার কী?

—আমার কি? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দেব। দেখেছিস—কিল? ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঐ লোকটার দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মতো শক্ত নিটোল শরীর! জিভের নিচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোনো উত্তর না দিয়া তীব্র তির্যক ভঙ্গিতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বদিকে চুনে-হলুদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মতো নিটোল গোল চাঁদ উঠিতেছিল; বোলপুরের একেবারে শেষে রেললাইনের ধারে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাটে বসিয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়া ছিল। চাঁদের আলো তখনও দুধবরণ হইয়া উঠে নাই; ঘোলাটে আবছা আলোয় চারিদিক ঝাপসা দেখাইতেছিল। সহসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে চমকিয়া উঠিয়াছিল; সেই

লোকটা! সে হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজও বেশ মনে আছে—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোল খাইয়াছিল; হাসিলে তাহার গালে টোল খাইত—সে বলিয়াছিল, কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে এলি যে?

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, তুমি যাও বলছি—নইলে আমি চেঁচাব।

—চেঁচাবি? দেখেছিস পুকুরের পাঁক—টুঁটি টিপে তোকে পুঁতে দোব ঐ পাঁকে!

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ঠুকিয়া চিৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল—ধ্যে-ৎ।

সে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল—আঁচল-ধরা হাতের মুঠিটা খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকটার হি-হি করিয়া সে কী হাসি! সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল, দূর-রো ফ্যাঁচকাঁদুনে মেয়ে কোথাকার! ভাগ্!

তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল, তুমি মারবা নাকি?

—না না, মারব কেনে? তোকে শুধালাম কোথা বাড়ি তোর, তু একেবারে খ্যাঁক করে উঠলি! তাতেই বলি—।

বলিয়া আবার সে হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

—আমার বাড়ি অ্যানেক ধুর, হুই পাথরঘাটা!

—কী নাম বটে তোর? কী জাত?

—নাম বটে আমার 'সোরধনি', লোকে ডাকে 'সরা' বলে। আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুব খুশি হইয়া বলিয়াছিল, আমরাও ডোম! তা ঘর থেকে পালিয়ে এলি কেনে?

তাহার চোখে আবার জল আসিয়ছিল; সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল কী বলিবে!

—রাগ করে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

—না।

—তবে?

—আমার মা-বাবা কেউ নাইকো কিনা! কে খেতে পরতে দেবে? তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাকে।

—বিয়ে করিস না কেনে? বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে—তাহার মতো ডাইনিকে, কে বিবাহ করিবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা আজও অকারণে নতশিরে মাটির উপর ক্রমাগত হাত বুলাইয়া ধূলা-কাঁকর জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে; মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হঠাৎ সূতা হইতে সূচটা পড়িয়া গেল।

আহ্, কী মশা! মৌমাছির চাক ভাঙিলে যেমন মাছিগুলা মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই করিয়া সর্বাঙ্গে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। কই? মেয়েটা আর ছেলেটার কথাবার্তা তো আর

শোনা যায় না! চলিয়া গিয়াছে! সন্তর্পণে ঘরের দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া বৃদ্ধা আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল। কাল আবার উহারা নিশ্চয়ই আসিবে। তাহার ঘরের পাশাপাশি জায়গার মতো আর এমন নিরিবিলি জায়গা কোথায়? এ চাকলার কেউ আসিতে সাহস করিবে না! তবে উহারা ঠিকই আসিবে। ভালোবাসার কি ভয় আছে!

আকস্মাৎ তার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল; আচ্ছা ঐ ছোঁড়াটাকে সে খাইবে? শক্ত সমর্থ জোয়ান শরীর!

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বারবার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল—না না।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে আপন মনে দুলিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর উঠিয়া উঠানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়া দিল। সে বাট বহিতেছে! আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ তো ঘুমাইবার তার উপায় নাই। ইচ্ছা হয় এই ছাতি-ফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। লোকে বলে, সে গাছ চালাইতে জানে—জানিলে কিন্তু ভালো হইত! গাছের উপর বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু-হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত! কিন্তু ঐ মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলা শোনা হইত না। উহারা ঠিক কাল আবার আসিবে।

হি হি হি! ঠিক আসিয়াছে! ছোঁড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরাইয়া পথের দিকে চাহিতেছে। আসিবে রে,—সে আসিবে।

তাহার নিজের কথাই তো বেশ মনে অছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় সে জোয়ানটি ঠিক পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল। তাহার আগেই আসিয়া বসিয়াছিল। পথের দিকে চাহিয়া আপন মনে পা দোলাইতে ছিল। সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

এসেছিস? আমি সেই কখন এসে বসে আছি!

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই কথা—সে তাহাকে এই কথাটিই বলিয়াছিল। ওহ্, ঐ ছোঁড়াটাও ঠিক সেই কথা বলিতেছে! মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; নিশ্চয় সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সে দিন সে একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল। তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, কাল তো মুড়ি পড়ে গিয়েছিল। লে।

সে কিন্তু হাত বাড়াইতে পারে নাই। তাহার বুকের দুর্দান্ত লোভ—সাপের মতো তাহার ডাইনি মনটা বেদের বাঁশি শুনিয়া যেন কেবলই দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়াছিল, ছোবল মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তারপর সে কী করিয়াছিল? হ্যাঁ মনে আছে। সে কি আর ইহারা জানে, না, পারে? ও মাগো! ঠিক তাই; এ ছেলেটাও যে মেয়েটার মুখে নিজ হাতে কী তুলিয়া দিতেছে। বুড়ি দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পাড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই তাহার হাসি থামিয়া গেল। সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছের গায়ে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল—ইহার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল, আমাকে বিয়ে করবি 'সরা'?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিছু ভাবিতেও পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল—হাত-পা ঘামিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, আমি কলে কাজ করি, রোজগার করি অনেক। তা, জাতে পতিত বলে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি ?

ঝরনার ধারে প্রণয়ী যুবকটি বলিল, এই গাঁয়ে সবাই হাঁ-হাঁ করবে--আমার জাতগুষ্টিতেও করবে, তোর জাতগুষ্টিতেও করবে। তার চেয়ে চল্ আমরা পালিয়ে যাই। সেইখানে দুজনায় 'সাঙা' করে বেশ থাকব।

মৃদুস্বরে কথা, কিন্তু এই নিস্তব্ধ স্থানটির মধ্যে কথাগুলি যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—তাহারাও পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল। মাড়োয়ারীবাবুর কলের ধারেই একখানা ঘর তৈয়ারি করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল। 'বয়লা' না কী বলে--সেই প্রকাণ্ড পিপের মতো কলটা—সেই কলটায় সে কয়লা ঠেলিত। তাহার মজুরি ছিল সকলের চেয়ে বেশি।

ঝরনার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল—উ হবে না। আমাকে রুপোর চুড়ি গড়িয়ে না দিলে তোর কোনো কথা আমি শুনব না। আর আমার খুঁটে দশটি টাকা তু বেঁধে দে--তবে আমি যাব। লইলে বিদেশে পয়সার অভাবে খেতে পাব না, তা হবে না।

ছি ছি! মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়! এতবড় একটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহার নাকি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনোদিন! মরণ তোমার! রুপার চুড়ি কি, একদিন সোনার শাঁখা-বাঁধা উঠিবে তোর হাতে! ছি!

ছেলেটি কথার কোনো জবাব দিল না। মেয়েটিই আবার বলিল, কি, রা কাড়িস না যি? কি বলছিস্ বল্? আমি আর দাঁড়াতে লারব কিন্তুক।

ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল বলিল, কী বলব বল্ ? টাকা থাকলে আমি তো দিতাম, রুপোর চুড়িও দিতাম—বলতে হত না তোকে।

মেয়েটা বেশ হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গ করিয়াই বলিল, তবে আমি চললাম।

—যা।

—আর যেন ডাকিস না!

—বেশ।

অল্প একটু দূর যাইতেই শাদা-কাপড়-পরা মেয়েটি ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। ছেলেটা চুপ করিয়া ঝরনার ধারে বসিয়া রহিল। আহা! ছেলেটার যেমন কপাল! হয়তো বিবাগী হইয়াই চলিয়া যাইবে, নয়তো গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে! বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল। ইহার চেয়ে তাহার সেই রুপার চুড়ি কয়গাছা দিলে হয় না? আর টাকা? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে তো তাহার এককুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা—নাহয় পাঁচটা সে দিতে পারে। তাহাতেই হইবে। মেয়েটা আর বোধ হয় আপত্তি করিবে না। আহা! জোয়ান বয়স, সুখের সময়, সখের সময়—আহা! ছেলেটিকে ডাকিয়া রুপার চুড়ি ও টাকা সে দিবে, আর উহার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরমা সম্বন্ধ পাতাইবে। গোটাকতক চোখা-চোখা ঠাট্টা সে যা করিবে!

মাটিতে হাতের ভর দিয়া উঠিয়া কুঁজীর মতো সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে, লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই। হাসিয়া সে ডাকিল--বলি ওহে লাগর—শুনছ?

দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিল; পর মুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে বৃদ্ধার একটা অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল; ক্রুদ্ধ মার্জারীর মতো ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল—মর মর ! তুই মর ! সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত মাংস মেদ মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা একটা আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল ! পর মুহূর্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল ! সর্বনাশী ডাইনি বাউড়িদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় গিয়াছিল ঐ ঝরনার ধারে; মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা বাঘিনীর মতো জানিতে পারিয়া নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষুসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে; অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরা সে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কী রক্তপাত ! তাহার পরই প্রবল জ্বর; আর কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মতো বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে !

কিন্তু সে তাহার কী করিবে ?

কেন সে পলাইতে গেল ? পলাইয়া যাইবে ? তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইবে ? সেই তাহার মতো শক্তিমান পুরুষ—যে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিত—শেষ পর্যন্ত তাহারই অবস্থা হইয়া গিয়াছিল মাংসশূন্য একখানি মাছের কাঁটার মতো।

কে এক গুণীন নাকি আসিয়াছে—বলিয়াছে এই ছেলেটাকে ভালো করিয়া দিবে ! তাহাকেও দেখিয়া শহরের ডাক্তারে বলিয়াছিল ভালো করিয়া দিবে। তিলে তিলে শুকাইয়া ফ্যাকাশে হইয়া সে মরিয়াছিল ! রোগ—ঘুসঘুসে জ্বর, কাশি ! তবে রক্তবমি করিয়াছিল কেন সে ?

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে উন্মত্ত অস্থিরতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধা আপনার উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সম্মুখে ছাতি-ফাটার মাঠ আগুনে পুড়িতেছে নিস্পন্দ শবদেহের মতো। সমস্ত মাঠটার মধ্যে আজ আর কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নাই। বাতাস পর্যন্ত স্থির হইয়া আছে।

যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসিত, কোনোদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশে নিষ্ঠুর শোষণ হইতে বাঁচাইবে ঐ গুণীনটা !

হি-হি করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে সে হাসিয়া উঠিল। উহ্ কী ভীষণ হাঁপ ধরিতেছে তাহার ! দম যেন বন্ধ হইয়া গেল ! কী যন্ত্রণা ! উহ্—যন্ত্রণায় বুক ফাটাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। ঐ গুণীনটা বোধ হয় তাহাকে মন্ত্রপ্রহারে জর্জর করিবার চেষ্টা করিতেছে ! কর্ তোর যথাসাধ্য তুই কর্ !

এখান হইতে কিন্তু পলাইতে হইবে ! তাহার মৃত্যুর পর বোলপুরের লোকে যখন তাহার গোপন কথাটা জানিতে পারিয়াছিল, তখন কী দুর্দশাই না তাহার করিয়াছিল ! সে নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কলের সেই হাড়িদের শঙ্করীর সহিত তাহার ভাব ছিল,

তাহার কাছেই সে একদিন মনের আক্ষেপে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর সে গ্রামের বাহিরে একধারে লোকের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া বাস করিতেছে। কত জায়গাই যে সে ফিরিল! আবার যে কোথায় যাইবে!

ও কি! অকস্মাৎ উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি উচ্চ কান্নার রোল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া পাগলের মতো ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সন্ধ্যার মুখে সে একটি ছোট পুঁটলি লইয়া ছাতি-ফাটার মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল। পলাইবে—সে পলাইবে।

একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত নিথর, স্তব্ধ। তাহারই মধ্যে পায়ে পায়ে ধূলা উড়াইয়া বৃদ্ধা ডাইনি পলাইয়া যাইতেছিল। কতকটা দূর আসিয়া সে বসিল, চলিবার শক্তি যেন সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল—ওগো, তুমি ফিরে এসো গো!

উহ্, তাহার নরুন-দিয়া-চেরা ছুরির মতো চোখের সম্মুখে আকাশের বায়ুকোণটা তাহার চোখের তারার মতোই খয়ের রঙের হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কিছু ধূলার আস্তরণের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কাল-বৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! দুর্দান্ত ঘূর্ণিঝড়! সঙ্গে মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি!

পরদিন সকালে ছাতি-ফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরি গুল্মের একটা কাঁটা ডালের সুঁচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশপথে যাইতে যাইতে ঐ গুনীনের মন্ত্রপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখির মতো পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নিচে ছাতি-ফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মতো ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।

অতীতকালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমাণ বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

প্রাগৈতিহাসিক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দল ধরা পড়িয়া যায়। এগার জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্শার খোঁচা খাইয়া পালাইতে পারিয়াছিল। রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথাভাঙা পুলটার নিচে পৌঁছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া শরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়া ছিল। রাত্রে আরও নয় ক্রোশ হাঁটিয়া একেবারে পেহ্লাদ বাগদির বাড়ি চিতলপুরে।

পেহ্লাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই।

কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'ঘাওখান সহজ লয় স্যাঙ্গাত। উটি পাকব। গা ফুলব। জানাজানি হয়ে গেলে আমি কনে যামু? খুনটো যদি না করতিস—'

'তরেই খুন করতে মন লইতাছে পেহ্লাদ।'

'এই জনমে লা, স্যাঙাত।'

বন কাছেই ছিল, মাইল পাঁচেক উত্তরে। ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল। পেহ্লাদ নিজে বাঁশ কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিন্‌জুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল। তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদন করিয়া দিল। বলিল, 'বাদলায় বাঘটাঘ সব পাহাড়ের উপরে গেছে গা। সাপে যদি না কাটে ত আরাম কইরাই থাকবি ভিখু।'

'খামু কী ?'

'চিড়া গুড় দিলাম যে? দুদিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম; রোজ আইলে মাইনষে সন্দ করব।'

কাঁধের ঘা-টা লতাপাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহ্লাদ চলিয়া গেল। রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল। পরদিন টের পাওয়া গেল পেহ্লাদের কথাই ঠিক, কাঁধের ঘা ভিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে। ডান হাতটি ভিখুর ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নাড়িবার সামর্থ্য নাই।

বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনি অবস্থায় সেই বনে জলে ভিজিয়া, মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া, দেহের কোনো-না-কোনো অংশ হইতে ঘণ্টায় একটি করিয়া জোঁক টানিয়া ছাড়াইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে ভিখু দুদিন দুরাত্রি সঙ্কীর্ণ মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল। বৃষ্টির সময় ছাট লাগিয়া সে ভিজিয়া গেল, রোদের সময় ভাপসা গাঢ় গুমোটে সে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল, পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার একমুহূর্তের স্বস্তি রহিল না। পেহ্লাদ কয়েকটা বিড়ি দিয়া গিয়াছিল, সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। তিন-চার দিনের মতো চিড়া আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই!

গুড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনও মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে। ওদের হতাশার জ্বালা ভিখু অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে।

মনে মনে পেহ্লাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখুই তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল। যেদিন পেহ্লাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসির জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল। বিকাল পর্যন্ত পেহলাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়ন আর সহিতে না পারিয়া কলসিটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরের নালা হইতে আধ কলসি জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না; অসহ্য ক্ষুধা পাইলে চিঁড়া চিবাইয়া সে পেট ভরাইল। এক হাতে ক্রমাগত সে পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল। বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া জোঁক ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চারিদিকে লাগাইয়া দিল। সবুজ রঙের একটা সাপকে একবার মাথার কাছে সিনজুরি গাছের পাতার ফাঁকে উঁকি দিতে দেখিয়া পুরা দু-ঘন্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু-এক ঘন্টা অন্তরই চারিদিকের ঝোপে ঝপঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া মুখে যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তাড়াইতে লাগিল।

মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায় মানুষ সে, বাঁচিবেই।

পেহ্লাদ গ্রামান্তরে কুটুমবাড়ি গিয়াছিল। পরদিনও সে আসিল না। কুটুমবাড়ির বিবাহোৎসবে তাড়ি টানিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিল। বনের মধ্যে ভিখু কীভাবে দিন-রাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবার তাহার মনেও পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। শরীর তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে। জ্বরটা একটু কমিয়াছে কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম-ছুটানো তাড়ির নেশার মতোই ভিখুকে আচ্ছন্ন, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সে আর এখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না। জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নিচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসিটা একসময় নিচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পুঁটুলির মধ্যে চিঁড়াগুলি পচিতে আরম্ভ করে, রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশেপাশে শিয়াল ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুটুমবাড়ি হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহ্লাদ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ভিখুর জন্য একবাটি ভাত ও কয়েকটা পুঁটিমাছ ভাজা আর একটু পুঁই-চচ্চড়ি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ওগুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল। তারপর বাড়ি গিয়া বাঁশের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মই-এ শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল। ঘরের মাচার উপর খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল।

আর এমনি শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও একরকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিন্ত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভালো হইল না। গাছের মরা ডালের মতো

শুকাইয়া গিয়া অবশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। প্রথমে অতি কষ্টে সে হাতটা একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তাহার নষ্ট হইয়া গেল।

কাঁধের ঘা শুকাইয়া আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিখু তাহার একটিমাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাঁশের মই বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল।

পেহ্লাদ সে সময় বাড়ি ছিল না। ভরতের সঙ্গে তাড়ি গিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পেহ্লাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে। পেহ্লাদের বৌ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিখুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালাইয়া যাইতেছিল, ভিখু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু পেহ্লাদের বৌ বাগ্‌দির মেয়ে। দুর্বল শরীরে বাঁ হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল।

তাড়ির নেশায় পেহ্লাদের মনে হইল, এমন নেমকহারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য। হাতের মোটা লাঠিটা বৌ-এর পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইতে গিয়া নেশার মধ্যেও টের পাইতে তাহার বাকি রহিল না যে কাজটা যত বড় কর্তব্যই হোক সম্ভব একেবারেই নয়, ভিখু তাহার ধারালো দা-টি বাঁ হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে। সুতরাং খুনাখুনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথার আদানপ্রদান হইয়া গেল।

শেষে পেহ্লাদ বলিল, 'তোর লাইগা আমার সাত টাকা খরচ গেছে, টাকাটা দে, দিয়া বাইরা আমার বাড়ির থেইক্যা, —দূর হ।'

ভিখু বলিল, 'আমার কোমরে একটা বাজু বাইন্ধা রাখছিলাম, তুই চুরি করছস! আগে আমার বাজু ফিরাইয়া দে, তবে যামু!'

'তোর বাজুর খবর জানে কেডারে?'

'বাজু দে কইলাম পেহ্লাদ, ভালো চাস তো! বাজু না দিলি সা-বাড়ির মেজোকত্তার মতো গলাডা তোর একখান কোপেই দুই ফাঁক কইরা ফেলুম, এই তোরে আমি কইয়া রাখলাম। বাজু পালি আমি অখনি যামু গিয়া।' কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না। তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলিয়া ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলিল। পেহ্লাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। পেহ্লাদ ও তার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ফেলিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল। ভিখুর শুকাইয়া আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল, হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ধুঁকিতে ধুঁকিতে সে চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু দুপুর রাতে পেহ্লাদের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাগ্‌দি পাড়ায় বিষম হৈচৈ বাঁধাইয়া দিল।

পেহ্লাদ কপাল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল, 'হায় সর্বনাশ, হায় সর্বনাশ! ঘরকে আমার শনি আইছিল গো, হায় সর্বনাশ!'

কিন্তু পুলিশের টানাটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারা ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না।

সেই রাত্রি হইতেই ভিখুর আদিম অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল। চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে। পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়া একটা জেলেডিঙি চুরি

করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। একটা চ্যাপটা বাঁশকে হালের মতো ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোনোরকমে নৌকার মুখ সিধা রাখিয়াছিল। সকাল হওয়ার আগে শুধু স্রোতের টানে সে বেশিদূর আগাইতে পারে নাই।

ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহ্লাদ হয়তো তার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে, মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না। পুলিশ বহুদিন যাবত তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে খুনটা হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পেহ্লাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশেপাশে চারিদিকেই তাহার খোঁজ করিবে। বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা। কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কাল বিকাল হইতে সে কিছুই খায় নাই। দুজন জোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর-ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল। নদীর জলে ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের রাস্তার প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দুটো পয়সা দিবান কর্তা?'

তাহার মাথার জটবাঁধা চাপ-চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া, আর দড়ির মতো শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল। তিনি তাহাকে একটা পয়সা দান করিলেন।

ভিখু বলিল, 'একটা দিলেন বাবু? আর একটা দেন।'

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন, 'একটা দিলাম তাতে হল না,—ভাগ!'

এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাঁহাকে একটা বিশ্রী গাল দিয়া বসে। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। গাল দেওয়ার বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনের মুড়িমুড়কির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতেখড়ি।

কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইন-কানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্মভিখারির মতো আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমে ক্রমে জট বাঁধিয়া দলা-মলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মতো মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটা ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নিচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে একপয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা

পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নিচে ইটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনো দিন রাঁধে ছোট মাছ, কোনো দিন তরকারি। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতেই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুল গাছটার নিচে গিয়া বসে।

সারাটা দিন শ্বাস টানা শ্বাস টানা কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায় : হেই বাবা একটা পয়সা; আমায় দিলে ভগবান দিব; হেই বাবা একটা পয়সা —

অনেক প্রাচীন বুলির মতো 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' শ্লোকটা আসলে অসত্য। সারাদিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজার-দেড়-হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়। আধলার সংখ্যা বেশি হইলেও সারাদিনে ভিখুর পাঁচ-ছ আনা রোজগার হয়, কিন্তু সাধারণত তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে। সপ্তাহে এখানে দুদিন হাট বসে। হাট বারে উপার্জন তাহার একটি পুরো টাকার নিচে নামে না।

তখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদীর দুই তীর কাশে শাদা হইয়া উঠিয়াছে। নদীর কাছেই বিনু মাঝির বাড়ির পাশে ভাঙা চালটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে। রাত্রে সে ঐখানেই শুইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জীর্ণ এবং পুরু একটা কাঁথা সে সংগ্রহ করিয়াছে, লোকের বাড়ির খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায়। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরে গৃহস্থবাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে। তাই পুঁটুলি করিয়া বালিশের মতো সে ব্যবহার করে। রাত্রে নদীর জলো বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুঁটুলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয়।

সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ-সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি অওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায়, কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না। পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে। এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাউ না পাইলে দোকানিকে মারিতে উঠে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে।

রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।

নারী-সঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভালো লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।

তাড়ির দোকানে ভাঁড়ে ভাঁড়ে তাড়ি গিলিয়া সে হল্লা করিত, টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মত্ত রাত্রি যাপন করিত, আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত,

মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর সেই আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কী আছে? পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পালাইয়া বেড়াইয়া আর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল। তাহার দলের অনেকেই বার বার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশি তাহার নাগাল পায় নাই। রাখু বাগ্‌দির সঙ্গে পাহানার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার সাত বছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল, কিন্তু দু-বছরের বেশি কেহ তাহাকে জেলে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙাইয়া সে পলাইয়াছিল। তারপর একা সে গৃহস্থবাড়িতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে, দিন দুপুরে পুকুরঘাটে একাকিনী গৃহস্থবধূর মুখ চাপিয়া গলার হার, হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে। রাখুর বউকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইয়া সমুদ্র ডিঙাইয়া পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায়। ছ-মাস পরে রাখুর বৌকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পর পর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলির নামও এখন তাহার স্মরণ নাই। তারপর এই সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেজ ভাইটার গলাটা সে দায়ের এক কোপে দু-ফাঁক করিয়া দিয়া আসিয়াছে।

কী জীবন তাহার ছিল এখন কী হইয়াছে! মানুষ খুন করিতে যাহার ভালো লাগিত সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটু টিটকারি দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে। দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তার নাই। কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানি হিসাব মেলায়, বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা থাকে একা। এদিকে ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্নু মাঝির চালাটার নিচে সে চুপচাপ শুইয়া থাকে।

ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আপসোসের সীমা থাকে না। সংসারের অসংখ্য ভীরু ও দুর্বল নরনারীর মধ্যে এতবড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরাল শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে! এমন কপালও মানুষের হয়?

তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে। আপসোসেই নিবৃত্তি। একা ভিখু আর থাকিতে পারে না।

বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিনী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নিচ হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।

এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে। সেজন্যে ঘা-টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।

ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে। বলে, 'ঘাটি সারব না, লয়?

ভিখারিনী বলে, 'খুব! ওসুদ দিলে অখনি সারে।'

ভিখু সাগ্রহে বলে, 'সারা তবে, ওসুদ দিয়া চটপট সারাইয়া ল। ঘাটি সারলে তোর আর ভিক মাগতি অইব না, —জানস? আমি তোরে রাখুম।'

'আমি থাকলি ত।'

'ক্যান? থাকবি না ক্যান? খাওয়ামু পরামু আরামে রাখুম, পায়ের পরনি পা দিয়া গাঁট

হইয়া বইয়া থাকবি। না করস তুই কিয়ের লেগে?'

অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিনী নয়। খানিকটা তামাকপাতা মুখে গুঁজিয়া সে বলে, 'দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘা মুই তখন পামু কোয়ানে?'

ভিখু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে, সুখে রাখিবার লোভ দেখায়। কিন্তু ভিখারিনী কোনোমতেই রাজি হয় না। ভিখু ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসে।

এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ারভাটা হয়, শীতের আমেজে বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয়। ভিখুর চালার পাশের কলাবাগানে চাঁপাকলার কাঁদি শেষ হইয়া আসে। বিন্নু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বৌকে রুপার গোট কিনিয়া দেয়। তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরাল ও জমাট হইয়া ওঠে। ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায়। নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না।

একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিনীর কাছে যায়। বলে, 'আইচ্ছা, ল, ঘা লইয়াই চল্।'

ভিখারিনী বলে, 'আগে আইবার পার নাই? যা, অখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া।'

'ক্যান? ছালি খাওনের কথাডা কী?'

'তোর লাইগা হাঁ কইরা বইসা আছি ভাবছস তুই, বটে? আমি উই উয়ার সাথে রইছি।'

ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মতো জোয়ান দাড়িঅলা এক খঞ্জ ভিখারি খানিক তফাতে আসন করিয়াছে। তাহার ডান হাতটির মতো একটি পা হাঁটুর নিচে শুকাইয়া গিয়াছে, বিশেষ যত্ন সহকারে এই অংশটুকু সামনে মেলিয়া রাখিয়া সে আল্লার নামে সকলের দয়া প্রার্থনা করিতেছে।

পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম হ্রস্ব পা।

ভিখারিনী আবার বলিল, 'বসস্ যে? যা, পলাইয়া যা, দেখলি খুন কইরা ফেলাইব কইয়া দিলাম।'

ভিখু বলে, 'আরে থো, খুন অমন সব হালাই করতিছে! উয়ার মতো দশটা মাইন্‌ষেরে আমি একা ঘায়েল কইরা দিবার পাত্তাম, তা জানস? আমি তোরে রাখুম।'

ভিখারিনী বলে, 'পারস তো যা না, উয়ার সাথে লাগ না গিয়া। আমার কাছে কী?'

'উয়াকে তুই ছাড়ান দে। আমার কাছে চ'।'

'ইরে সোনা! তামুক খাবা? ঘা দেইখা পিছাইছিলি, তোর লগে আর খাতির কিরে হালার পুত? উয়ারে ছাড়ুম ক্যান? উয়ার মতো কামাস তুই? ঘর আছে তোর? ভাগবি তো ভাগ, নইলে গাল দিমু কইলাম।'

ভিখু তখনকার মতো প্রস্থান করে, কিন্তু হাল ছাড়ে না। ভিখারিনীকে একা দেখলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'তোর নামটা কী র‍্যা?'

এমনি তাহারা পরিচয়হীন যে এতকাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও তাহারা বোধ করে নাই।

ভিখারিনী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে।

'ফের লাগতে আইছস? হোই ও বুড়ির কাছে যা।' ভিখু তাহার কাছে উবু হয়ে বসে। পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া

বেড়ায়। ঝুলির ভিতর হইতে মর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিনীর সামনে রাখিয়া বলে, 'খা। তোর লেগে চুরি কইরা আনছি।'

ভিখারিনী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে। খুশি হইয়া বলে, 'নাম শুনবার চাস? পাঁচী কয় মোরে—পাঁচী। তুই কলা দিছস্, নাম কইলাম, এবারে ভাগ।'

ভিখু উঠিবার নাম করে না। অতবড় একটা কলা দিয়া শুধু নাম শুনিয়া খুশি হওয়ার মতো শৌখিন সে নয়। যতক্ষণ পারে ধূলার উপর উবু হইয়া বসিয়া পাঁচীর সঙ্গে সে আলাপ করে। ওদের স্তরে নামিয়া না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে। পাঁচীর সঙ্গীটির নাম বসির। তাহার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল।

'সেলাম মিয়া।'

বসির বলিল, 'ইদিকে ঘুরাফিরা কি জন্য? সেলাম মিয়া হতিছে! লাঠির এক ঘায়ে শিরটা ছেঁচ্যা দিমু নে।'

দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল। ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না।

নিজের তেঁতুলগাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল, 'র, তোরে নিপাত করতেছি।'

বসির বলিল, 'ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।'

এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়া আসিল। পথ দিয়া প্রত্যহ নূতন নূতন লোক যাতায়াত করে না। একেবারে প্রথমবারের মতো যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা দুই মাসের ভিতরে মুষ্টিমেয় হইয়া আসে। ভিখুকে একবার যাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনরায় তাহাকে দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না। সংসারে ভিখারির অভাব নাই।

কোনোরকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল। হাটবার ছাড়া রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না। সে ভাবনায় পড়িয়া গেল।

শীত পড়িলে খোলা চালার নিচে থাকা কষ্টকর হইবে। যেখানে হোক চারিদিকে ঘেরা যেমন-তেমন ঘর একখানা তাহার চাই। মাথা গুঁজিবার মতো একটা ঠাঁই আর দুবেলা খাইতে না পারিলে কোনো যুবতী ভিখারিনীই তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজি হইবে না। অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়া আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয়তো পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না।

যেভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতে হইবে।

এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোনো উপায়ই সে দেখিতে পায় না। চুরি-ডাকাতির উপায় নাই, মজুর খাটিবার উপায় নাই, একেবার খুন না করিয়া ফেলিলে কাহারো কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া একহাতে সম্ভব নয়। পাঁচীকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয়। এক-একদিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্যে মন ছটফট করিয়া

ওঠে। নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হয় পৃথিবীতে যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।

আরও কিছুকাল ভিখু এমনি অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া, জমানো টাকা কটি কোমরের কাপড়ে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পাইয়াছিল। অবসর মতো পাথরে ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে। এই অস্ত্রটি সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল।

অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশভরা তারা তখন ঝিকিমিকি করিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। বহুকাল পরে মধ্য রাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা লইয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর সহসা অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল। নিজের মনে অস্ফুট স্বরে সে বলিয়া উঠিল, 'বাঁটি লইয়া ডানটিরে যদি রেহাই দিতা ভগমান!'

নদীর ধারে ধারে আধমাইল হাঁটিয়া গিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল। বাজার বাঁ-হাতি রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোট ছোট অলিগলি দিয়া শহরের অপর প্রান্তে গিয়া পৌছিল। শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে। নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু-মাইল তফাত এই রাস্তারই পাশে মাইলখানেক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণে দিক পরিবর্তন করিয়াছে।

কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি বাড়ি চোখে পড়ে। তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙার দেখা পাওয়া যায়। এমনি একটা জঙ্গলের ধারে খানিকটা জমি সাফ করিয়া পাঁচ-সাতখানা কুঁড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে। তার মধ্যে একটি কুঁড়ে বসিরের। ভোরে উঠিয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পাঁচী গাছের পাতা জ্বালাইয়া ভাত রাঁধে, বসির টানে তামাক। রাত্রে পাঁচী পায়ের ঘায়ে ন্যাকড়ার পট্টি জড়ায়। বাঁশের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটাকাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাদের নীড়, তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে একটা ভাপসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুটা দিয়া বাহিরের বাতাসে মিশিতে থাকে।

ঘুমের ঘোরে বসির নাক ডাকায়। পাঁচী বিড়বিড় করিয়া বকে।

ভিখু একদিন পিছু পিছু আসিয়া ওদের ঘর দেখিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচুবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল। ভিখারির কুঁড়ে, দরজার ঝাঁপটি পাঁচী ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই, শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ঝাঁপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া দিয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিকটি বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরে তারার আলো ছিল, ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোরও অভাব। দেশলাই জ্বালিবার অতিরিক্ত হাত নাই; ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃদপিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাঁ হাতের আঘাত ঠিক জায়গামতো না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে মুশকিল অনেক।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটিমাত্র আঘাতে

ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখা দিকটা প্রায় তিন আঙুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল। অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। একহাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল।

পাঁচীকে বলিল, 'চুপ থাক; চিল্লাবি তো তোরেও মাইরা ফেলামু।'

পাঁচী চেঁচাইল না, ভয়ে গোঙাইতে লাগিল।

ভিখু তখন আবার বলিল, 'একটুকু আওয়াজ লয়, ভালো চাস তো একদম চুপ মাইরা থাক্।'

বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাত সরাইয়া লইল।

দম লইয়া বলিল, 'আলোটা জ্বাইলা দে, পাঁচী।'

পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটিমাত্র হাতের সাহায্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্বের তাহার সীমা ছিল না। পাঁচীর দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'দেখছস? কেডা কারে খুন করল দেখছস্? তখন পই-পই কইরা কইলাম; মিয়াবাই ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার লারবা গো, ছারান দেও। শুইনে মিয়াবায়ের অইল গোসা! কয় কিনা শির ছেঁচ্যা দিমু! দেন গো দেন, শির ছেঁচ্যাই দেন মিয়াবাই।' বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ করিয়া হাসিতে লাগিল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ঠ্যারাইন, বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরে দিমু নাকি সাবার কইরা —অ্যাঁ?'

পাঁচী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'ইবারে কী করবি?'

'দ্যাখ কী করি! পয়সা কড়ি কনে গুইনা রাখছে, আগে তাই ক।'

বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাঁচী অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল। ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভান করিল। কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না।

বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয়, টাকায় আধুলিতে একশত টাকার উপর। একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে ইহার চেয়ে বেশি উপার্জন করিয়াছে। তবু সে খুশি হইল। বলিল, কী কী নিবি পুঁটলি বাঁইধা ফ্যালা পাঁচী। তারপর ল' রাইত থাকতে মেলা করি। খানিক বাদে নওমির দান্দ উঠব, আলোয় আলোয় পথটুকু পার হমু।

পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ উঠব পাঁচী।

পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'

'সদর! ঘাটে না চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্যি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।'

পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচী কষ্ট পাইতেছিল। ভিখু সহসা একসময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে নি তুই ব্যথা পাস পাঁচী?'

'হ।' ব্যথা জানায় পাঁচী।

'পিঠে চাপামু?'

'পারবি ক্যান?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ চলিতে লাগিল। পথের দুদিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আমরা তিনজন

বুদ্ধদেব বসু

আমরা তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম : আমি, আর অসিত, আর হিতাংশু; ঢাকায় পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে ঢাকা সকাল !

এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিল তারা-কুটির, সেইটে হিতাংশুদের। বাপ তার পেনশন পাওয়া সব-জজ, অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন, এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে বড় রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বর বাড়ি তারা-কুটির, দু-অর্থেই তাই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা-লম্বা চোর-কাঁটা ছাওয়া মাঠ ভরে গেল, কিন্তু তারা-কুটিরের জুড়ি আর হল না।

আমরা এসেছিলাম কিছু পরে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচ্ছে। একটা সময় ছিল, যখন ঐ তিনখানাই বাড়ি ছিল পুরানা পল্টনে; বাকিটা ছিল এবড়োখেবড়ো জমি, ধুলো আর কাদা, বর্ষায় গোড়ালি-জলে গা-ডোবানো হল্‌দে-হল্‌দে-সবুজ রঙের ব্যাঙ আর নধর সবুজ ভিজে-ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘ-ডাকা দুপুর !

আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সবসময়—যতটা এবং যতক্ষণ থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাকত, 'বিকাশ ! বিকাশ !' আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম, দেখতাম অসিত সাইকেলে বসে আছে এক-পা মাটিতে ঠেকিয়ে—এমন লম্বা ও, কাঁধে হাত রাখতে কনুই ধরে যেত আমার। হিতাংশুকে ডাকতে হত না, দাঁড়িয়ে থাকত তাদের বাগানের ছোট ফটকের ধারে, কি বসে থাকত বাগানের নিচু দেয়ালে পা ঝুলিয়ে, তারপর অসিত সাইকেলে চেপে চলে যেত পাকা সড়ক ধরে স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে; আমি আর হিতাংশু ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম হাতে হাত ধরে, হাওয়ায় গন্ধ, যেন কিসের, যেন কার, সে-গন্ধ আজও যেন পাই, কী মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে !

বিকেলে দুটি সাইকেলে তিনজনে চড়ে প্রায়ই আমরা শহরে যেতাম, কোনোদিন বিখ্যাত ঘোষবাবুর দোকানে চপ-কটলেট খেতে, কোনোদিন শহরে একটিমাত্র সিনেমায়, কোনোদিন চিনেবাদাম পকেটে নিয়ে নদীর ধারে। সাইকেল চালানোটা আমার জীবনে হল না—চেষ্টা করেও শিখ্‌তে পারি নি ওটা, কিন্তু ঐ দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক; কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর গলগ্রহ হয়ে লম্বা-লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েই। আবার কত সন্ধ্যা কেটেছে পুরানা পল্টনেরই মাঠে, ঘাসের সোফায় শুয়ে বসে, ছোট ছোট তারা ফুট্‌ছে আকাশে, চোর-কাঁটা ফুট্‌ছে কাপড়ে, হিতাংশুদের সামনের বারান্দার লণ্ঠনটা মিটমিট করছে দূর থেকে। এ-সময়টা হিতাংশু বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকত না—আটটার মধ্যে

তাকে ফিরতেই হত বাড়িতে। অত কড়া শাসন আমার উপর ছিল না, অসিতের উপরেও না, দুজনে বসে থাকতাম অন্ধকারে, ফেরবার সময় আস্তে আস্তে একবার ডাকতাম হিতাংশুকে, পড়া ফলে উঠে এসে চুপি চুপি দু-একটা কথা বলেই সে চলে যেত।

আমরা তিনজন তিনজনের প্রেমে পড়েছিলাম, আবার তিনজন একসঙ্গে অন্য একজনের প্রেমে পড়লাম, সেই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে উনিশ-শো-সাতাশ সনে।

নাম তার—অন্তরা। তখনকার ঢাকার পক্ষে নামটি অত্যন্তই শৌখিন, কিন্তু ঢাকার মতো কিছুই তো তাঁদের নয়, মেয়ের নামই বা হবে কেন। ভদ্রলোক বাড়িতেও প্যান্ট-প'রে থাকেন, আর ভদ্রমহিলা এমন সাজেন যে পিছন থেকে হঠাৎ তাঁকে তাঁর মেয়ে বলে ভুল হয়—আর তাঁর মেয়ে, তাঁদের মেয়ে, তার কথা আর কী বলব। সে সকালে বাগানে বেড়ায়, দুপুরে বারান্দায় বসে থাকে বই কোলে নিয়ে, বিকেলে রাস্তায় হাঁটে প্রায় আমাদের গা ঘেঁষেই, সবসময় দেখা যায় তাকে, মাঝে মাঝে শোনা যায় গলার আওয়াজ; —সেই ঢাকায়, সুদূর সাতাশ সনে, কোনো-একটি মেয়েকে চোখে দেখা যখন সহজ ছিল না, যখন বন্ধ-গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড় ছিল আমাদের স্বর্গের আভাস, তখন—এই যে মেয়ে, যাকে আমরা দেখতে পাই এক-একদিন এক-এক রঙের শাড়িতে, আর তার উপর নাম যার অন্তরা, তার প্রেমে পড়ব না এমন সাধ্য কী আমাদের!

নামটা কিন্তু বের করেছিলাম আমি। রোজ সই করে পাউরুটি রাখতে হয় আমাকে, একদিন রুটিওলার খাতায় নতুন একটা নাম দেখলাম নীল কালিতে বাংলা হরফে পরিষ্কার করে লেখা : 'অন্তরা দে'। একটু তাকিয়ে থাকলাম লেখাটুকুর দিকে, খাতা ফিরিয়ে দিতে একটু দেরি করলাম, তারপর বিকেলে হিতাংশুকে বললাম, 'নাম কি অন্তরা?'

'কার'—কিন্তু তক্ষুনি কথাটা বুঝে নিয়ে হিতাংশু বল্‌ল, 'বোধ হয়।' অসিত বলল, 'সুন্দর নাম!'

'ডাকে তরু বলে।'

তরু! এই ঢাকা শহরেই দু-তিনশো অন্তত তরু আছে, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার মনে হল, এবং আমি বুঝলাম অসিতেরও মনে হল যে, সমস্ত বাংলাভাষায় তরুর মতো এমন একটি মধুর শব্দ আর নেই। তা হোক, হিতাংশুর একটু বাজে কথা বলাই চাই, কেননা, যাকে নিয়ে বা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, তাদেরই বাড়ির একতালায় তারা ভাড়াটে, আমাদের চাইতে বেশি না-জানলে ওর মান থাকে না। তাই ও নাকের বাঁশিটা একটু কুঁচকে বলল, 'অন্তরা থেকে তরু—এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো না কেন, খুব ভালো!' গলা চড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ভেতরটা কেমন দমে গেল।

'আমি হলে অন্তরাই ডাকতাম।'

কী সাহস! কী দুঃসাহস! তুমি ডাকতে, তাও আবার নাম ধরে! ইস্! প্রতিবাদের তাপে আমার মুখ গরম হয়ে উঠল, বেশ চোখাচোখা কয়েকটা কথা মনে-মনে গোছাচ্ছি, ফস করে অসিত বলে উঠল, 'আমিও তা-ই।'

বিশ্বাসঘাতক!

এ-রকম ছোট ছোট ঝগড়া প্রায়ই হত আমাদের। এমন দিন যায় না যেদিন ওকে নিয়ে কোনো কথা না হয়, আর এমন কোনো কথা হয় না যাতে তিনজনেই একমত হতে পারি। সেদিন যে নীল শাড়ি পরেছিল তাতেই বেশি মানিয়েছিল, না কালকের বেগনি রঙেরটায়;

সকালে যখন বাগানে দাঁড়িয়ে ছিল তখন পিঠের উপর বেণী দুলছিল, না চুল খোলা ছিল, বিকেলে বারান্দায় বসে কোলের উপর কাগজ রেখে কি চিঠি লিখছিল, না আঁক কষছিল—এমনি সব বিষয় নিয়ে ঠ্যাচামেচি করে আমরা গলা ফাটাতুম। সবচেয়ে বেশি তর্ক হত যে-কথা নিয়ে সেটা একটু অদ্ভুত : ওর মুখের সঙ্গে মোনালিসার মিল কি খুব বেশি, না অল্প একটু, না কিছুই না। আমি তখন প্রথম মোনালিসার ছাপা-ছবি দেখেছি এবং বন্ধুদের দেখিয়েছি। হঠাৎ একদিন আমারই মুখ দিয়ে বেরোল কথাটা—'ওর মুখ অনেকটা মোনালিসার মতো।' তারপর এ নিয়ে অসংখ্য কথা খরচ করেছি আমরা, কোনো মীমাংসা হয় নি; তবে একটা সুবিধা এই হল যে আমাদের মুখে-মুখে ওর নাম হয়ে গেল মোনালিসা। অন্তরায় যতই সুর ঝরুক, তরুতে যতই তরুণতা, যে-নামে ওকে সবাই ডাকে সে-নামে তো আমরা ওকে ভাবতে পারি না—অন্য একটি নাম, যা শুধু আমরা জানি, আর কেউ জানে না, এমন একটি নাম পেয়ে আমরা যেন ওকেই পেলাম।

হিতাংশুকে প্রায়ই বলতাম, 'তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবেই—একই তো বাড়ি,' আর হিতাংশুও একটু লাল হয়ে বলত, 'যাহ্!' যার মানে হচ্ছে যে সেটা হলেও হতে পারে—আর তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই চলত আমাদের, কিন্তু মনে-মনে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এ-সব কিছু না, শুধুই কথার কথা।

একদিন সন্ধ্যার একটু পরে তিনজনে ফিরছি সাইকেলে রমনা বেড়িয়ে, আমি হিতাংশুর পিছনে, নির্জন পথে নিশ্চিন্তে গল্প চালিয়েছি, হঠাৎ হিতাংশু কথা বন্ধ করে সাইকেলের উপর কী রকম কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম সাইকেল থেকে, টাল সামলাতে গিয়ে টেনে ধরলাম হিতাংশুর জামার গলা; 'উহ্' বলে সে নেমে পড়ল, আমিও পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায় কে একজন বলে উঠলেন, 'Take care, young man!' তাকিয়ে দেখি, ঠিক আমাদের সামনে দে-সাহেব দাঁড়িয়ে, আর তাঁর স্ত্রী—আর কন্যা। অসিত সাইকেলটা একটু ঘুরিয়ে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে চুপ করে আছে, তার মুখের ভাবটা বেশ বীরের মতো।

'Really you must—' বলতে বলতে দে-সাহেব হিতাংশুর মুখের উপর চোখ রাখলেন।—'Oh it's you ! কেশব বাবুর ছেলে!'

'আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিতাংশুটা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

আর এরা—তিনজনকে একসঙ্গেই তো দেখতে পাই সবসময়। বন্ধু বুঝি? বেশ, বেশ। I like young men. এসো একদিন আমাদের ওখানে তোমরা।'

ওঁরা চলে গেলেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাসের উপর পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে। একটু পরে অসিত বলল, 'কী কাণ্ড! হিতাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিলে না?'

'না তো! ঘাবড়াব কেন? ব্রেকটা হঠাৎ —'

'কোনোদিন তো এ-রকম হয় না। আর আজ কিনা ওঁদের সামনে —'

'বেশ তো! হয়েছে কী? কারো গায়েও পড়ে নি, পড়েও যাই নি, হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে —'

'না, না, তুমি তো ঠিকই নেমেছিলে, তবে তোমার মুখটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। আর বিকাশ তো —'

আমার নাম করতেই আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, 'চুপ করো, ভালো লাগে না!'

'ও বোধহয় একটু হেসেছিল', অসিত তবু ছাড়ল না। ('ও' বলতে কাকে বোঝায় তা বোধহয় না বললেও চলে।)

'হেসেছিল তো বয়ে গেল !' চিৎকার করল হিতাংশু, কিন্তু সে চিৎকার যেন কান্না।

'তুমি দেখেছিলে বিকাশ? ঠিক মোনালিসার হাসির মতো কি?'

'যা বোঝো না তা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না !' বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল। সে-রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না, দুদিন আধমরা হয়ে রইলাম, সাতদিন মন-মরা।

রাগ করি আর যা-ই করি, আমাদের মধ্যে অসিতটাই তুখোড়। সে কেবলই বলতে লাগল, 'চল্ না একদিন যাই আমরা ওঁদের ওখানে।'

'পাগল।'

'পাগল কেন? দে-সাহেব বললেন তো যেতে ! বললেন না?'

ক্রমে-ক্রমে হিতাংশুর আর আমারও ধারণা জন্মাল যে দে-সাহেব সত্যিই আমাদের যেতে বলেছেন, আমরা গেলে রীতিমতো সুখী হবেন তিনি, না-গেলে দুঃখিত হবেন—এমনকি তাঁকে অসম্মানই করা হবে তাতে। তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য ক্রমশই আমরা বেশিরকম ব্যস্ত হতে লাগলাম। রোজ সকালে স্থির করি; 'আজ' রোজ বিকেলে মনে করি, 'আজ থাক'। কোনোদিন দেখি ওঁরা বাগানে বসেছেন বেতের চেয়ারে; কোনোদিন বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো, তার মানে শহরের একমাত্র ব্যারিস্টার দাস-সাহেব বেড়াতে এসেছেন। আর কোনোদিন বা চুপচাপ দেখে ধরে নিই ওঁরা বাড়ি নেই। দৈবাৎ একদিন হয়তো চোখে পড়ে দে-সাহেব একা বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, মনে হয় এইটে ভারি সুসময়, কিন্তু বাগানের গেটের সামনে পা থমকে যায় আমাদের, অসিতের যতটা নয় ততটা হিতাংশুর, হিতাংশুর ততটা নয় যতটা আমার, একটু ঠেলাঠেলি ফিশফিশানি হয়, আর শেষ পর্যন্ত তারা-কুটির ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে আমরা অন্যদিকে চলে যাই। কেবলই মনে হয় এখন গেলে বিরক্ত হবেন, আবার তখনই ভাবি—বিরক্ত কেন, আর এ নিয়ে এত ভাববারই বা কী আছে, মানুষ কি মানুষের সঙ্গে দেখা করে না? আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই, যাব, বসব, আলাপ করব, চলে আসব—ব্যস্ !

সেদিন আকাশে মেঘ টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি। বাইরে থেকে মনে হল ওঁরা বাড়িতেই আছেন। ছোট্ট গেট ঠেলে সকলের আগে ঢুকল অসিত, লম্বা, ফরসা, সুশ্রী; তারপর হিতাংশু, গম্ভীর, চশমা পরা, ভদ্রলোক মাফিক; আর সকলের শেষে পুঁচকে আমি। বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম আমরা, কাউকে ডাকব কিনা, কাকে ডাকব, কী বলে ডাকব এইসব আমরা যতক্ষণ ধরে ভাবছি ততক্ষণ পরদা ঠেলে দে-সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধরে বললেন, 'Yes' ?

এই বিজাতীয় সম্ভাষণে সপ্রতিভ অসিতও একটু বিচলিত হল। 'আমি—আমরা—মানে আমরা এসেছিলাম—আপনি বলেছিলেন—' আবছা আলোয় তখন দে-সাহেব আমাদের চিনলেন। 'ও, তোমরা ! তা ...'

অসিত আবার বলল, 'আপনি বলেছিলেন আমাদের একদিন আসতে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ ...' একটু কেশে—'এসো, এসো তোমরা', পরদা তুলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন দে-সাহেব, আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।

'যাও, ভিতরে যাও।'

ঢুকতে গিয়ে হিতাংশু তার নিজেরই বাড়ির চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিল, খুব লাগল আমার, কিন্তু চুপ করে থাকা ছাড়া তখন আর উপায় কী। আমাদের কাদামাখা স্যান্ডেলে ঝকঝকে মেঝে নোংরা করে এলাম আমরা। কী সুন্দর সাজানো ঘর, এমন কখনো দেখি নি। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনের দিকে সোফায় বসে মিসেস দে উল বুনছেন, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো কোণের চেয়ারটিতে বসে আছে আমাদের মোনালিসা, কোলের উপর মস্ত মোটা নীল মলাটের বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে।

দে-সাহেব বললেন, 'সুমি, এই আমাদের পুরানা পল্টনের থ্রি মস্কেটিঅর্স। এটি কেশববাবুর ছেলে, আর এরা ... '

হিতাংশু পরিচয় করিয়ে দিল, 'এর নাম অসিত আর এই হচ্ছে বিকাশ।'

মিসেস দে মৃদু হেসে মৃদুস্বরে বললেন, 'তিন বন্ধু বুঝি তোমরা? বেশ, রোজই তো দেখি তোমাদের। বোসো।'

একটা লম্বা সোফায় ঝুপঝুপ বসে পড়লাম তিনজনে। মিসেস দে ডাক দিলেন—'তরু'!

মোনালিসা চোখ তুলল।

'এঁরা আমাদের প্রতিবেশী—আর এই আমার মেয়ে।'

মোনালিসা বই রেখে উঠল, ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের মতো দাঁড়াল, অল্প হাওয়ায় গাছ যেমন নড়ে, তেমনি করে মাথা নোয়াল একটু, তারপর আবার চেয়ারে বসে বই খুলে চোখ নিচু করল।

আমার মনে হল আমি স্বপ্ন দেখছি।

অসিত কলকাতার ছেলে, আমাদের সকলের চাইতে খবর রাখে বেশি, চটপট কথা বলতেও পারে; আর হিতাংশু—সে-ও তার বাবার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছে, উচ্চারণ পরিষ্কার, আর তা ছাড়া এই তারা-কুটির তো তাদেরই বাড়ি। কথাবার্তা যা একটু তা ওরা দুজনেই বলল, আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ, কী বলব ভেবেও পেলাম না, বলতেও ভরসা হল না, পাছে আমার বাঙাল টান বেরিয়ে পড়ে। মোনালিসাকে দেখবার ইচ্ছা ভেতরে-ভেতরে পাগল করে দিচ্ছিল আমাকে, কিন্তু কিছুতেই কি একবারও চোখ তুলতে পারলাম!

ইলেকট্রিসিটি না থাকলে জীবন কীরকম দুর্বহ, ঢাকার মশা কী সাঙ্ঘাতিক, রমনার দৃশ্য কত সুন্দর, এসব কথা শেষ হবার পর মিসেস দে বললেন, 'তোমরা কি কলেজে পড়?'

অসিত যথাযথ জবাব দিয়ে সগর্বে বলল, 'হিতাংশু পনের টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে ম্যাট্রিকে।'

'বাহ্ বেশ, বেশ। আমার মেয়ে তো অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষাই দিতে চায় না।'

হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে তারের মতো একটি আওয়াজ বেজে উঠল, 'বাবা, কীটস্ কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন? '

দে-সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কেউ বলতে পারো?'

অসিত ফস করে বলল, 'বিকাশ নিশ্চয়ই বলতে পারবে—বিকাশ কবিতা লেখে।'

'সত্যি?' মুখে একটি ছেলেমানুষি হাসি ফোটালেন মিসেস দে, আর মুহূর্তের জন্য—আমি অনুভব করলাম—মোনালিসার চোখও আমার উপর পড়ল। হাত ঘেমে উঠল আমার,

কানের ভিতর যেন পিঁ-পিঁ আওয়াজ দিচ্ছে।

সবসুদ্ধু কতটুকু সময়? পনের মিনিট? কুড়ি মিনিট? কিন্তু বেরিয়ে এলাম যখন, এত ক্লান্ত লাগল, কলেজে চারটে-পাঁচটা লেকচার শুনেও তত লাগে না।

মিসেস দে জোর করেই দুটা ছাতা দিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু ছাতা আমরা খুললাম না, টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। হঠাৎ অসিত—বকবক না করে ও থাকতেও পারে না—বলে উঠল, 'কী চমৎকার ওঁরা!'

'সত্যি! চমৎকার!' হিতাংশু সায় দিল সঙ্গে সঙ্গে।

আমি কথা বললাম না, কোনো কথাই ভালো লাগছিল না আমার।

একটু পরে অসিত আবার বলল, 'কিন্তু জুতোগুলো বাইরে ছেড়ে গেলেই পারতাম আমরা! আর, হিতাংশু, তুমি আবার আজ হোঁচট খেলে!'

'কখন?'

'ঘরে ঢুকতে গিয়ে।'

'যাহ্!'

'যাহ্ আবার কী। আর ঘরে ঢুকে নমস্কার করেছিলে তো মিসেস দে-কে?'

'নিশ্চয়ই!' একটু চুপ করে থাকল হিতাংশু, তারপর হঠাৎ বলল, 'কিন্তু যখন—মোনালিসা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল...'

অন্ধকারে আমরা তিনবন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, এবং অন্ধকারেই বোঝা গেল যে তিনজনেরই মুখ ফ্যাকাশে হয়েছে। একটি মেয়ে, একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, আর আমরা কিনা জরদগবের মতো বসেই থাকলাম—উঠে দাঁড়ালাম না, কিছু বললাম না, কিচ্ছু না। ওঁরা আমাদের বাঙাল ভাবলেন, কাঠ-বাঙাল, জংলি, বর্বর, খাস কলকাতার ছেলে অসিত মিত্তিরও আমাদের মুখ-রক্ষা করতে পারল না।

কী যে মন-খারাপ হল, কী আর বলব।

পরের দিন তিনজনে আবার গেলাম ছাতা ফেরৎ দিতে। চাকর আমাদের ঘরে নিয়ে বসাল, তারপর—তারপর মোনালিসাই এল ঘরে, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম, একটু হেসে বললাম, 'এই ছাতাটা...' 'ও মা! এর জন্য আবার...বসুন...।' মনে-মনে এইরকম ভেবে গিয়েছিলাম ঘটনাটা, কিন্তু হল একটু অন্যরকম। চাকর এসে ছাতাটি নিয়ে ভিতরে চলে গেল, আর ফিরে এল না, কেউই এল না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ফিরে এলাম—কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। না, না। ঐ সুন্দর করে সাজানো ঘর, যেখানে শাদা ধবধবে আলোয় দেওয়ালের প্রতিটি কোণ ঝকঝক করে, আর কোণের চেয়ারে বসে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটি কোনো এক নীল মলাটের আশ্চর্য বইয়ের পাতা ওল্টায়—সেখানে জায়গা নেই আমাদের। কিন্তু তাতে কী। মোনালিসা —মোনালিসাই। ঝমঝম করে বর্ষা নামল পুরানা পল্টনে, মেঘে ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুরু দুরু দুপুর, নীল জোছনায় ভিজে-ভিজে রাত্রি। পনের দিন ধরে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পর প্রথম যেদিন রোদ উঠল, সেদিন বাইরে এসে দেখি শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারের মোটরগাড়ি তারা-কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে।

হিতাংশুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?'

'না তো!'

তবে কি ওদের বাড়িতে—প্রশ্নটা উচ্চারিত না হয়েও ব্যক্ত হল। পরের দিন হিতাংশু গম্ভীর মুখে বলল, 'ওদের বাড়িতেই অসুখ।'

'কার?'

'ওরই অসুখ।'

'ওর অসুখ!'

'ওর!'

সেদিনও বড় ডাক্তারের গাড়ি দেখলাম, তার পরদিন দু-বেলাই। আমরা কি একবার যেতে পারি না, কিছু করতে পারি না? ঘুরঘুর করতে লাগলাম রাস্তায়, ডাক্তারের গাড়ির আড়ালে। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, দে-সাহেব সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত। আমাদের চোখেই দেখলেন না তিনি, তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন, 'তোমরা একবার যাও তো ভেতরে, উনি একটু কথা বলবেন।'

সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস দে, এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়ে অসিত বলল, 'আমাদের ডেকেছেন, মাসিমা?' কলকাতার ছেলে, ডাক-টাকগুলো দিব্যি আসে, আমি মরে গেলেও ও-সব পারি না।

মিসেস দে বললেন, 'তরুর অসুখ।' তার কণ্ঠস্বর আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিল।

'কী অসুখ?'

'টাইফয়েড!' ঐ ভয়ঙ্কর শব্দটা আস্তে উচ্চারণ করে তিনি বললেন, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না।'

অসিত বলে উঠল, 'কিছু ভাববেন না। আমরা সব করে দেব।'

'পারবে, পারবে তোমরা? দ্যাখো বাবা, এই একটাই সন্তান আমার...' বলতে বলতে চোখে তাঁর জল এল।

মোনালিসা, কোনোদিন জানলে না তুমি, কোনোদিন জানবে না, কী ভালো আমাদের লেগেছিল, কী সুখী আমরা হয়েছিলাম, সেই সাতাশ সনের বর্ষায়, পুরানা পল্টনে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেই জ্বরে ঝড়ে, বৃষ্টিতে থমথমে অন্ধকারে, ছমছমে ছায়ায়। দেড়মাস তুমি শুয়েছিলে, দেড়মাস তুমি আমাদের ছিলে। দেড়মাস ধরে সুখের স্পন্দন দিনে-রাত্রে কখনো থামল না আমাদের হৃৎপিণ্ডে। তোমার বাবা আপিস যান, ফিরে এসে রোগীর ঘরে উঁকি দিয়েই হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়েন ইজি-চেয়ারে; তোমার মার সারাদিন পায়ের পাতা দাঁড়ায় না, কিন্তু রাত্তিরে আর পারেন না তিনি, রোগীর ঘরেই ক্যাম্পখাটে ঘুমোন, আর সারারাত পালা করে করে জেগে থাকি আমরা—কখনো একসঙ্গে দুজনে, ক্বচিৎ তিনজনেই, বেশির ভাগ একলা একজন। আর তোমাকে নিয়ে এই একলা রাত-জাগার সুখ আমিই পেয়েছি বেশি —অসিত সারাদিন ছুটোছুটি করেছে সাইকেলে, হিতাংশুও বারবার। সবচেয়ে কাছের বরফের দোকান এক মাইল দূরে, ওষুধের দোকান দুমাইল, ডাক্তারের বাড়ি সাড়ে-তিন মাইল—কোনোদিন অসিত দশবার যাচ্ছে, দশবার আসছে, কতবার ভিজে কাপড় শুকোল তার গায়ে, কোনোদিন রাত বারোটায় হিতাংশু ছুটল বরফ আনতে, সব দোকান বন্ধ, রেলের স্টেশন নিঃসাড়, নদীর ধারে বরফের ডিপোতে গিয়ে লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে বরফ নিয়ে আসতে-আসতে দুটো বেজে গেল তার, এদিকে আমি আইসব্যাগে জলের পরিমাণ অনুভব করছি বার-বার, আর অসিত বাথরুমে বরফের

ছোট ছোট ছড়ানো টুকরো দু-হাতে কুড়োচ্ছে। সাইকেলে আমার দখল নেই বলে বাইরের কাজ আমি কিছুই প্রায় পারি না, সারাদিন ঘুর-ঘুর করি তোমার মা-র কাছে কাছে, হাতের কাছে এগিয়ে দিই সব, ওষুধ ঢালি, টেম্পারেচর লিখি, ডাক্তার এলে তাঁর ব্যাগ হাতে করে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই। তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত বাড়ে, বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র, সে-সমুদ্রে ক্ষীণ আলো-জ্বলা একটি নৌকোয় তুমি আর আমি চলেছি ভেসে, তুমি তা জানলে না মোনালিসা, কোনোদিন জানবে না।

সারাদিন, সারারাত মোনালিসা মূর্ছিতের মতো পড়ে থাকে, ভুল বকে মাঝে মাঝে — এত ক্ষীণ-স্বর যে কী বলছে বোঝা যায় না—তবু যে কটি কথা আমরা কানে শুনেছি তা-ই যত্ন করে তুলে রেখেছি মনে, একের শোনা কথা অন্য দুজনকে বলাই চাই; কখনো হঠাৎ একটু অবসর হলে তিনজন বসে সেই কথা কটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, যেন তিনজন কৃপণ সারা পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণি-মুক্তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে, বন্ধ ঘরে, অন্ধকার রাত্রে। যদি বলেছে 'উহ্', সে যেন বাঁশির ফুঁয়ের মতো আমাদের হৃদয়কে দুলিয়ে গেছে; যদি বলেছে 'জল', তাতে যেন জলের সমস্ত তরলতা ছলছল করে উঠেছে আমাদের মনে।

একরাত্রে হিতাংশু বাড়ি গেছে আর অসিত বারান্দায় বিছানায় ঘুমুচ্ছে, আমি জেগে আছি একা। টেবিলের উপর জ্বলছে মোমবাতি, দেওয়ালের গায়ে ছায়া কাঁপছে বড়-বড়, অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে ঐ আলোটুকু যেন আর পারছে না; আমিও আর পারছি না ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, ডাকাতের মতো ঘুম আমার হাত-পা কেটে-কেটে টুকরো করে দিল, মোমের মতোই গলে যাচ্ছে আমার শরীর। যতবার চাবুক মেরে নিজেকে সোজা করছি; লাফিয়ে উঠছে অতল থেকে বিশাল ঢেউ। ডুবতে ডুবতে মনে হল মোনালিসা তুমিও কি এমনি করেই যুদ্ধ করছ মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যু কি এই ঘুমের মতোই টানছে তোমাকে, তবু তুমি আছ—কেমন করে আছ! মনে হতেই ঘুম ছুটল। সোজা হয়ে বসলাম, তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে সেই ক্ষীণ আলোয় কাঁপা-কাঁপা ছায়ায় রাত চারটের স্তব্ধ মহান মুহূর্তে। তুমি কি মরবে? তুমি কি বেঁচে উঠবে? কোনো উত্তর নেই। তোমার কি ঘুম পেয়েছে? উত্তর নেই। তুমি ঘুমিয়েছ না জেগে আছ? উত্তর নেই। তবুও আমি তাকিয়ে থাকলাম, মনে হল এর উত্তর আমি পাবই, পাব তোমারই মুখে, তোমার মুখের কোনো একটি ভঙ্গিতে হয়তো—কে জানে—তোমার কণ্ঠেরই কোনো একটি কথায়। আর, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আস্তে আস্তে চোখ তোমার খুলে গেল, মস্ত বড় হল, উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে স্থির হল আমার মুখের উপর। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল— 'কে?'

আমি তাড়াতাড়ি আইসব্যাগ চেপে ধরলাম।

'কে তুমি?'

'আমি।'

'তুমি কে?'

'আমি বিকাশ।'

'ও, বিকাশ। বিকাশ, এখন দিন, না রাত্রি?'

'রাত্রি।'

'ভোর হবে না?'

'হবে, আর দেরি নেই।'

'দেরি নেই? আমার ঘুম পাচ্ছে, বিকাশ।'

আমি তার কপালে আমার বরফে-ঠাণ্ডা হাত রাখলাম।

'আহ্, খুব ভালো লাগছে আমার।'

আমি বললাম, 'ঘুমোও।'

'তুমি চলে যাবে না তো?'

'না'।

'যাবে না তো?'

'না'।

'আমি তাহলে ঘুমুই, কেমন?'

নিশ্বাস উঠল আমার ভিতর থেকে, নিশ্বাসের স্বরে বললাম,—'ঘুমোও, ঘুমোও, আমি জেগে আছি, কোনো ভয় নেই।'

তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আর বাইরে দু-একটা পাখি ডাকল। ভোর হল।

প্রলাপ, জ্বরের প্রলাপ, তবু এটা আমারই থাক। একলা আমার। এই একটা কথা ওদের দুজনকে বলি নি, হয়তো ওদেরও এমন কিছু আছে যা আমি জানি না, আর-কেউ জানে না। তুমি, মোনালিসা, তুমিও জানলে না, জানবে না কোনোদিন।

তারপর একদিন তুমি ভালো হলে। সে তো খুব সুখের কথা, কিন্তু আমরা যেন বেকার হয়ে পড়লাম। আর তুমি ভাত-টাত খাবার দিন-পনের পরে যে-রবিবারে তোমার মা আমাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন, সেদিন আমার অন্তত মনে হল যে এই খাওয়াটা আমাদের ফেয়ারওএল পার্টি।

কিন্তু তা-ই বা কেন? এখনো আমরা যেতে পারি, বসতে পারি কাছে, গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাতে পারি, সে ক্লান্ত হলে পিঠের বালিশটা দিতে পারি ঠিক করে। এদিকে আকাশে কালো মেঘের সঙ্গে শাদা মেঘের খেলা, আর ফাঁকে-ফাঁকে নীলের মেলা, এই করে-করে আশ্বিন যেই এল, ওঁরা চলে গেলেন মেয়ের শরীর সারাতে রাঁচি!

বাঁধাছাঁদা থেকে আরম্ভ করে নারায়ণগঞ্জে স্টিমারে তুলে দেয়া পর্যন্ত সঙ্গে-সঙ্গে থাকলাম আমরা তিনজন।

ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়ানো মোনালিসার ছবিটি যখন চোখের সামনে ঝাপসা হল তখন আমাদের মনে পড়ল যে ওঁদের রাঁচির ঠিকানাটা জেনে রাখা হয় নি। আমার ইচ্ছে করছিল বাড়ি ফিরেই একটা চিঠি লিখে ডাকে দিই, তা আর হল না।

অসিত বলল, 'ওরই তো আগে লেখা উচিত।'

'তা কি আর লিখবে?' একটু হতাশভাবেই বলল হিতাংশু।

'কেন লিখবে না, না-লেখার কী আছে।'

কী আছে কে জানে, কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যেও কোনো চিঠি এল না। এল হিতাংশুর বাবার নামে মনি-অর্ডার, বাড়ি-ভাড়ার টাকা। তাই থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আমরা চিঠি লিখব স্থির করলাম। ও লেখে নি বলে আমরাও না-লিখে রাগ দেখাব, এটা কোনোরকম যুক্তি বলেই মনে হল না আমাদের। অসুখ থেকে উঠে গেছে, হয়তো এখনো ভালো করে শরীর সারে নি—কেমন আছে সে-খবরটা আমাদেরই তো নেয়া উচিত। কিন্তু চিঠিতে পাঠে কী লিখব? আপনি লিখব, না তুমি? মুখে ও অবশ্য আমাদের তুমিই বলেছে, আমরাও

তা-ই, কিন্তু কতটুকু কথাই বা এ পর্যন্ত বলেছি আমরা—এতখানি কথা নিশ্চয়ই বলি নি যার জোরে কালির আঁচড়ে জ্বলজ্বলে একটা তুমি লিখে ফেলা যায়। তাছাড়া, কী লিখবই বা চিঠিতে? কেমন, ভালো তো? এতেই তো সব কথা ফুরিয়ে গেল। আমরা কেমন আছি, কী করছি, সে-সব লিখলে তো কতই লেখা যায়—কিন্তু মোনালিসা কি আমাদের খবর জানতে ব্যস্ত?

অনেকক্ষণ ধ'রে জটলা করেও কোনো মীমাংসা যখন হল না, তখন ওরা আমাকেই বলল চিঠিখানা রচনা করে দিতে। আমি কবিতা-টবিতা লিখি, তাই।

সে-রাত্রেই লণ্ঠনের সামনে ঘামতে ঘামতে আমি লিখে ফেললাম :

সুচরিতাসু,

ভেবেছিলাম একখানা চিঠি আসবে, চিঠি এল না। ভাবতে-ভাবতে একুশ দিন কেটে গেল। খুবই ভালো লাগছে বুঝি রাঁচিতে? অবশ্য ভালো লাগলেই ভালো, আমরা তাতেই খুশি। তারা-কুটিরের একতলা বন্ধ, পুরানা-পল্টন তাই অন্ধকার। ওখানে পেট্রোম্যাক্স জ্বলত কিনা রোজ সন্ধ্যায়।

বসে-বসে রাঁচির ছবি দেখছি আমরা। পাহাড়, জঙ্গল, লাল কাঁকরের, কালো-কালো-সাঁওতাল। হাসি, আনন্দ, স্বাস্থ্য। সত্যি, কী বিশ্রী অসুখ গেল—আর যেন কখনো অসুখ না করে।

কারো কোনো অসুখ না করেও এমন কি হয় না যে আমাদের খুব খাটতে হয়? সত্যি, শুয়ে-বসে আর সময় কাটে না। চিঠি পেলে আবার আমাদের চিঠি লিখতে হবে, কিছু কাজ তবু জুটবে আমাদের।

মাসিমা মেসোমশায়কে প্রণাম।

আপনি তুমি দুটোই বাঁচিয়ে এর বেশি পারলাম না। এটুকুতেই রাত তিনটে বাজল। তাকিয়ে দেখি, কাটাকুটির ফাঁকে-ফাঁকে এই কটি কথা যেন কালো জঙ্গলে ঝিকিমিকি রোদ্দুর। বার-বার পড়লাম; মনে হল বেশ হয়েছে, আবার মনে হল ছি-ছি, ছিঁড়ে ফেলি এক্ষুনি। ছিঁড়ে ফেললামও, কিন্তু তার আগে ভালো একটি কাগজে নকল করে নিলাম, আর পরদিন তিনজন বসিয়ে দিলাম যে যার নাম সই, চোখ বুজে ছেড়ে দিলাম ডাকে।

ঢাকা থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে ঢাকা। চারদিন, পাঁচদিন—আচ্ছা ছ-দিন। না, চিঠি নেই। সন্ধ্যায় কুয়াশা, একটু একটু শীত; চিঠি নেই। শিউলি ফুরিয়ে স্থলপদ্ম ফুটল; চিঠি নেই।

চিঠি এল শেষ পর্যন্ত, হিতাংশুর নামে শীর্ণ একটি পোস্টকার্ড, লিখেছেন ওর মা। অনেকটা এইরকম :

কল্যাণীয়েষু,

হিতাংশু, অসিত, বিকাশ, তোমরা তিনজনে আমাদের বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। আমাদের রাঁচির মেয়াদ শেষ হল, শিগগিরই ফিরব। ইতিমধ্যে, হিতাংশু, তুমি যদি আমাদের ঘরগুলি খুলিয়ে তোমাদের চাকর দিয়ে ঝাটপাট করিয়ে রাখো, তাহলে বড় ভালো হয়। চাবি তোমার বাবার কাছে।

আশা করি ভালো আছ সকলে। তরুর শরীর এখন বেশ ভালো হয়েছে, মাঝে মাঝে সে তোমাদের কথা বলে। ইতি—

তোমাদের মাসিমা

মাঝে মাঝে আমাদের কথা বলে! আর আমাদের চিঠি? পোস্টকার্ডটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না যে চিঠিটা পৌঁছেছিল। কী হল চিঠির? কিন্তু সে কথা বেশিক্ষণ ভাববার সময় কই আমাদের, তক্ষুনি লেগে গেলাম কাজে। একদিনের মধ্যেই তারা-কুটিরের একতলাকে আমরা এমন করে ফেললাম যে মেঝেতে মুখ দেখা যায়। কয়েকদিন পরে আর-একটি পোস্টকার্ড : 'রবিবার ফিরছি, স্টেশনে এসো।' শুধু স্টেশনে! আমরা ছুটলাম নারায়ণগঞ্জে।

আ, কী সুন্দর দেখলাম মোনালিসাকে, কচিপাতার রঙের শাড়ি পরনে, লাল পাড়, লাল্‌চে মুখের রং, একটু মোটা হয়েছে, একটু যেন লম্বাও। পাছে কাছে দাঁড়ালে ধরা পড়ে যে সে আমাকে মাথায় ছাড়িয়ে গেছে, আমি একটু দূরে দূরে থাকলাম, হিতাংশু ছুটোছুটি করে বরফ লেমনেড কিন্‌তে লাগল, আর অসিত কুলিকে ঠেলে দিয়ে বড়-বড় বাক্স-বিছানা হাঁই-হাঁই করে তুলতে লাগল গাড়িতে।

মাসিমা বললেন, 'তোমরা এ-গাড়িতেই এসো।'

'না, না, সে কী কথা, আমরা—আমরা এই পাশের গাড়িতেই—'

'আরে এসো না'—বলে দে-সাহেব অসিতের পিঠের উপর হাত রাখলেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা : মনে হল আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টি এতকাল এই পঁয়তাল্লিশটি মিনিটের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। ফার্স্ট ক্লাসের গদিকে অবজ্ঞা করে আমরা বসলাম বাক্স-বিছানার উপর; তাতে একটা সুবিধে এই হল যে একসঙ্গে সকলকেই দেখতে পেলাম—দেখলাম মোনালিসা খুশি, ওর মা খুশি, বাবা খুশি, দেখতে-দেখতে আমরাও খুশিতে ভরে গেলাম; এতদিন যা বাধো-বাধো ছিল তা সহজ হল, এতদিন যা ইচ্ছে ছিল তা মূর্ত হল—রীতিমতো কলরব করতে-করতে চললাম আমরা; এতবড় রেলগাড়িটা যেন আমাদের খুশির বেগেই চলেছে। মোনালিসা নাম ধরে-ধরে ডাকতে লাগল আমাদের—কত তার কথা, কত গল্প—আর গাড়ি যখন ঢাকা স্টেশনের কাছাকাছি, কোনো-এক ঝর্নার বর্ণনা দিচ্ছে সে, হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, 'আমাদের চিঠি পেয়েছিলে?'

'তোমাদের চিঠি, না তোমার চিঠি?'

আমি একটু লাল হয়ে বললাম, 'জবাব দাও নি যে?'

'এতক্ষণ ধরে তো সেই জবাবই দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে আরও দেব।'

মিথ্যে বলে নি মোনালিসা। স্বর্গের দরজা হঠাৎ খুলে গেল আমাদের, আমরা তিনজন আমরা চারজন হয়ে উঠলাম।

তারপর একদিন মাসিমা আমাদের ডেকে বললেন, 'একবার তোমরা তরুর জন্য খেটেছ, আর একবার খাটতে হবে। উনতিরিশে অঘ্রান ওর বিয়ে।'

উনতিরিশে! আর দশ দিন পরে!

ছুটে গেলাম ওর কাছে, বললাম, 'মোনালিসা, এ কী শুনছি!'

ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী? কী বললে?'

গোপন নামটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় আমি একটু থমকে গেলাম, কিন্তু একবার যখন বেরিয়েই গেছে তখন আর ভয় কী! মরিয়া হলে মানুষের যে সাহস হয়, সেই সাহসের বশে আমি সোজা তাকালাম ওর চোখের দিকে, চোখের ভিতরে—যা যা আগে

আমি কখনো করি নি—বেগনি-বেগনি কালো রঙের ওর চোখ, একফোঁটা হীরের মতো চোখের মণি—তাকিয়ে থেকে আবার বললাম, 'মোনালিসা।'

'মোনালিসা! সে আবার কে?'

'মোনালিসা তোমারই নাম,' বলল অসিত, 'জানো না?'

'সে কী?'

হিতাংশু বলল, 'আর কোনো নামে আমরা ভাবতেই পারি না তোমাকে।'

'মজা-তো—' কৌতুকের রং লাগল ওর মুখে, মিলিয়ে গেল, পলকের জন্য ছায়া পড়ল সেখানে, যেন একটি ক্ষণিক বিষাদের মেঘ আস্তে ভেসে গেল মুখের উপর দিয়ে। একটু তাকিয়ে রইল, চোখের পাতা দুটি চোখের উপর নামল একবার।

হঠাৎ, মুহূর্তের জন্য—কী কারণে বুঝলাম না—আমাদের একটু যেন মন-খারাপ হল, কিন্তু তখনই তা উড়িয়ে দিল হাসির হাওয়া, আমাদের কথায় লাগল ঠাট্টার বুড়বুড়ি।

'কী শুনছি? মোনালিসা, কী শুনছি?'

'কী শুনছ বল তো?' বলে আঁচলে মুখ চেপে খিলখিল করে হেসে পালিয়ে গেল।

বর এল বিয়ের দুদিন আগে কলকাতা থেকে। ধবধবে ফরসা, ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরনে, কাছে দাঁড়ালে সূক্ষ্ম একটি সুগন্ধে মন যেন পাখি হয়ে উড়ে যায়। দেখে আমরা মুগ্ধ। হিতাংশু বারবার বলতে লাগল—'হীরেন বাবু কী সুন্দর দেখতে।'

অসিত জুড়ল— 'ধুতির পাড়টা!'

'পা দুটো!' বলে উঠল হিতাংশু। 'অমন ফরসা পা না-হলে কি আর ও-রকম ধুতি মানায়!'

আমি ফস্ করে বললাম, 'যা-ই বল, ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা।'

'কী! বোকা-বোকা!' অসিত চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু চিৎকার বেরোল না, কারণ লোকজন নিয়ে চ্যাঁচামেচি করে-করে বিয়ের অনেক আগেই সে-গলা ভেঙে বসে আছে। রেগে যাওয়া বেড়ালের মতো ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে বলল, 'এমন সুন্দর দেখেছ কখনো!'

'মোনালিসার মতো তো নয়!' আমি আমার গোঁ ছাড়লাম না।

'একজন কি আর-একজনের মতো হয় কখনো! খুব মানিয়েছে দুজনে। চমৎকার!' বলে অসিত লাফিয়ে সাইকেলে উঠে বোঁ করে কোথায় যেন চলে গেল। বিয়ের সমস্ত ভারই তার উপর, তর্ক করার সময় কোথায়।

বিয়ের দিন শানাইয়ের শব্দে রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই মনে পড়ল সেই আর-একটি শেষ-রাত্রি, যখন মৃত্যুর হাত থেকে—তা-ই মনে হয়েছিল তখন—মোনালিসাকে আমি ফিরিয়ে এনেছিলাম। সেদিন অন্ধকারের ভিতর থেকে একটু-একটু করে আল বেরিয়ে আসা দেখতে-দেখতে যে আনন্দে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দ ফিরে এল আমার বুকে, গা কাঁটা দিয়ে উঠল, শানাইয়ের সুরে চোখ ভরে ভরে উঠল জলে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না, তারা-ভরা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম এসে। শুনতে পেলাম বিয়েবাড়ির সাড়াশব্দ, শাঁখের ফুঁ—কাছে গেলাম। মনে হল আর একবার যদি দেখতে পাই, এই ভোর হবার আগের মুহূর্তে, যখন আকাশ ঘোষণা করছে মধ্যরাত্রি আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভোর—এই আশ্চর্য অপার্থিব সময়ে একটু দেখতে পাই যদি। কিন্তু না—গায়ে-হলুদ হচ্ছে, কত-কত অচেনা মেয়ে ঘিরে আছে তাঁকে, কত কাজ, কত সাজ—এর মধ্যে আমি

তো তাকে দেখতে পাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরকার চলাফেরা কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, আর সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে শানাইয়ের সুর ঝরল, আমার চোখের সামনে কাঁপতে-কাঁপতে তারার ঝাঁক মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল মাঠে মাঠে গাছপালার চেহারা, মাটির অবয়ব, পৃথিবীতে আর একবার ভোর হল।

সেদিনের অসিতের গলা একেবারেই ভেঙে গিয়ে নববধূর মতো ফিশফিশে হল। এত ব্যস্ত সে, আমাকে যেন চেনেই না। হিতাংশুও ব্যস্ত, ব্যস্ত এবং একটু গর্বিত, কেননা বর সদলে বাসা নিয়েছেন তাদেরই বাড়ির দুটো ঘরে, একতলা দোতলায় দূতের কাজ করতে-করতে সে স্যান্ডেল ক্ষইয়ে ফেলল। আমি একবার হিতাংশুকে, একবার অসিতকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম সারাদিন ভরে, কিন্তু আমার নিজের মনে হল না বিশেষ-কোনো কাজে লাগছি, আর শেষ পর্যন্ত যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে কনেকে সাত পাক ঘোরাবার সময় এল, তখনও আমি এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে দিয়ে অসিত আর হিতাংশুই পিঁড়ি তুলল, দুহাতে দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে ও সাত পাক ঘুরল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

বিয়ের পর দিন থেকেই আমরা তিনজন হীরেনবাবুর চাকর বনে গেলাম। তাঁর মতো সুন্দর কেউ না, তাঁর মতো বিদ্যেবুদ্ধি কারো নেই, তাঁর মতো ঠাট্টা কেউ করতে পারে না। অন্য পুরুষদের বাঁদর মনে হল তুলনায়—আমারও আর মনে হল না যে তাঁর ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা। এমনকি, আমি চেষ্টা করতে লাগলাম তাঁর মতো করে বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, হাসতে, কথা বলতে; ওরা দুজনও তা-ই করল, আবার তা দেখে হাসি পেল আমার, হয়তো প্রত্যেকেই আমরা অন্য দুজনের চেষ্টা দেখে হেসেছি মনে-মনে, যদিও মুখে কেউ কিছু বলি নি।

একদিন দুপুরবেলা হীরেনবাবুর কাছে খুব একটা মজার গল্প শুনছি, তিনি একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'দ্যাখো তো ভাই, তরু গেল কোথায়।'

'ডেকে আনব?' বলে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

দক্ষিণের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে মোনালিসা চুল আঁচড়াচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভুলে গেলাম। হঠাৎ কেমন নতুন লাগল তাকে, একটু অন্যরকম, সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, পরনে কড়কড়ে শাড়ি, কানে হাতে গলায় চিকচিকে গয়না, আর কেমন একটা গন্ধ দিচ্ছে গা থেকে—হীরেনবাবুর সেন্টের গন্ধ না, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ না, চুলের তেল কি মুখের পাউডারেরও না—আমার মনে হল এই সমস্ত মিলিত গন্ধের যেটা নির্যাস, সেটাই ভর করেছে মোনালিসার শরীরে। জোরে নিশ্বাস নিলাম কয়েকবার, মাথা যেন ঝিমঝিম করে উঠল।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী?'

'কিছু না'—সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়ল, 'হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

আমার কথাটা যেন শুনতেই পেল না মোনালিসা; নিশ্চিন্তে চুলই আঁচড়াতে লাগল।

'শুনছ না কথা! হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

'ডাকছেন তো হয়েছে কী। উনি ডাকলেই যেতে হবে?'

'বাহ্— !'

চিরুনি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল—'আর কী—চলেই তো যাব শিগ্‌গির।'

আমি বললাম, 'কত ভালো লাগবে তোমার কলকাতায় গিয়ে—ঢাকা কি একটা জায়গা!'

'ঢাকা খুব ভালো।' ঘাড় বেঁকিয়ে বাইরের দিকে তাকাল একটু, শীতের দুপুরের সবুজ-সোনালি মাঠের দিকে। সেদিকে তাকিয়েই আবার বলল, 'তোমরা আমাকে মনে রাখবে, বিকাশ?'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আর কথা না। চল এখন।'

'দেখছ না চুল আঁচড়াচ্ছি! বল গিয়ে এখন যেতে পারব না।'

কথা শুনে প্রায় ভড়কে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটু পরেই মোনালিসা উঠল, তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও এলাম ঘরে। এসেই বললাম, 'তারপর? সেই লোকটার কী হল, হীরেনবাবু?'

কিন্তু হীরেনবাবুর গল্প বলার উৎসাহ দেখি মিইয়ে গেছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, আর মোনালিসা চেয়ারে বসে টেবিলের কাপড় খুঁটতে লাগল।

আমি পীড়াপীড়ি করলাম, 'বলুন না কী হল!'

'এখন থাক।'

আমি খাটে বসে একটি ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে বললাম, 'এটা পড়েছি, ভারি মজার বই।'

হীরেনবাবু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আর-একটি বই টেনে নিয়ে বললেন, এ-বইটাও ভারি মজার। এক কাজ করো তুমি—এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়ে ফ্যালো, আমি চট করে একটু ঘুমিয়ে নিই। কেমন?' বলতে-বলতে তিনি একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

আর কথা না-বলে আস্তে বেরিয়ে এলাম আমি, পিঠ দিয়ে অনুভব করলাম ও-ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি গেলাম না; বারান্দায় যেখানে ও বসেছিল ঠিক সেখানটায় বসে পড়লাম। ওর চুলের গন্ধমাখা চিরুনিটা সেখানেই পড়ে ছিল, হাতে তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আস্তে আস্তে আঙুল চালাতে লাগলাম, বার-বার, বার-বার।

আরো একদিন, আরো একদিন। যাবার দিন এল, পেছোল, আর একটা, একটা দিন শুধু; তারপর চলে গেল।

চিঠি এল এবার, তিনজনের কাছে একখানা চিঠি, মোটা নীল খামে, আমার নামে। তিন-জনের হয়ে জবাব লিখলাম আমি, একটু লম্বাই হল, সেই সঙ্গে একটা কবিতাও লিখে ফেললাম, সেটা অবশ্য পাঠালাম না। চিঠি বন্ধ হয়ে গেল শিগগিরই, তারপর শুধুই কবিতা লিখতে লাগলাম, দেখতে দেখতে খাতা ভরে উঠল।

মাসিমার কাছে খবর পাই সবই। ভালো আছে ওরা, খুব ভালো আছে। হীরেন গাড়ি কিনেছে, সেদিন ওরা আসানসোল বেড়িয়ে এল। কলকাতায় কথা-বলা সিনেমা দেখাচ্ছে, টোম্যাটোর সের এক পয়সা, তবে শীত কমে গেছে হঠাৎ, অসুখ-বিসুখ দেখা না দেয়। আর-একটু গরম পড়লেই ওরা চলে যাবে দারজিলিং।

না-দেখা দারজিলিং-এর ছবি দেখতে লাগলাম মনে-মনে কিন্তু সে ছবি মুছে দিয়ে মাসিমা একদিন বললেন, 'ওরা তো আসছে।'

আসছে! এখানে! ঢাকায়! দারজিলিং-এর কী হল? আমাদের নীরব প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'শরীরটা খারাপ হয়েছে ওর, আমার কাছেই থাকবে এখন।'

'কী? অসুখ করেছে আবার?' চমকে উঠলাম তিনজনে।

'না, অসুখ ঠিক না, শরীরটা ভালো নেই আর কি,' মাসিমা মৃদু হাসলেন।

খুব খারাপ লাগল। খারাপ লাগল মাসিমার কথা শুনে, হাসি দেখে। শরীর ভালো না, অথচ অসুখও না—এ আবার কী-রকম কথা? আর মাসিমা কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ,—যেন খুশিই হয়েছেন খবর শুনে। রীতিমতো রাগ হল মনে মনে।

ওরা পৌঁছোবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা তিন মূর্তি গিয়ে হাজির হলাম। মোনালিসা সোফায় বসে আছে একটু এলিয়ে, হাতে সিগারেটের টিন। চকিতে আমরা তিনজন মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম—হীরেনবাবু কি সিগারেট ধরিয়েছেন ওকে?

আমাদের দেখে ফিকে একটু হাসল। কথা বলল না।

'কেমন আছ মোনালিসা?' আমরা চেষ্টা করলাম স্ফূর্তির সুর লাগাতে।

সিগারেটের টিনটা মুখের কাছে এনে তার সঙ্গে একবার মুখ ঠেকিয়ে ডালা বন্ধ করে বলল, 'এই—'

'তোমার নাকি অসুখ?'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে বলল 'তোমাদের কী খবর?' তারপর আস্তে আস্তে এটা-ওটা গল্প করতে লাগল, আর সিগারেটের টিনটা মুখে তুলতে লাগল ঘন ঘন।

হীরেনবাবু ঘরে এসে ব্যস্তভাবে বললেন, 'তরু এখন কেমন আছ?'

ক্লান্ত চোখ তুলে বলল, 'ভালো।'

'তুমি বরং একটু শোও।'

'না, এই বেশ আছি।'

'এই যে তোমরা এসেছ দেখছি। তরু তো এদিকে—'হঠাৎ থেমে গেলেন হীরেনবাবু।

'হয়েছে কী ওর?'

'হয় নি কিছু, তবে ... '

তবে কী? ওর কি এমন সাংঘাতিক কোনো অসুখ করেছে যা কারো কাছে বলাও যায় না? আর ও যেন কেমন হয়ে গেছে, যেন আধ-মরা, আস্তে কথা বলে, একভাবে স্থির হয়ে বসে থাকে, হাসি পেলে ভালো করে হাসেও না। মায়েদের মুখে শুনেছি যে বিয়ের পরে মেয়েদের শরীর আরো ভালো হয়, কিন্তু আমাদের মোনালিসার নাকি এই হল?

ছোট একটা প্লেট হাতে করে মাসিমা এসে বললেন, 'এটা একটু মুখে দিয়ে দ্যাখ তো।'

'কী, মা?'

'দ্যাখ না—' বলে তিনিই আঙুল দিয়ে মুখে গুঁজে দিলেন।

'না, না, আর না—,' মোনালিসার মুখে কষ্টের রেখা ফুটে উঠল, গলার কাছটায় হাত রেখে মুখ নিচু করল সে।

বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটলাম আমরা, মন বিষণ্ন খুবই। হঠাৎ অসিত বলল, 'ও বার-বার থুতু ফেলছিল সিগারেটের টিনে।'

'যাহ্!' আমি আঁতকে উঠলাম।

'সত্যি! আমি দেখলাম!'

হিতাংশু বলল, 'তা হলে এটাই বোধ হয় ওর অসুখ।'

'অসুখ না,' অসিত গম্ভীরভাবে বলল, 'ওর ছেলে হবে।'

শুনে হিতাংশুটা খুকখুক করে হেসে উঠল।

'হাসছ কেন?'—আমি রেগে গেলাম—'হাসবার কী আছে?'

অসিত বলল, 'ঐ জন্যেই তো টক এনে দিলেন মাসিমা। এ-রকম হলে টক খেতে ভালো লাগে।'

'তুমি সবই জানো!' রাগে গর্জে উঠলাম আমি।

'হল কী তোমার?' অসিত যেন সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল।

'যাও! কিছু ভালো লাগছে না আমার, আমি বাড়ি যাই।' ওদের ত্যাগ করে একা ফিরে এলাম বাড়িতে, বেলা শেষের আলোয় একটা বই খুলে পড়তে বসে গেলাম।

হীরেনবাবু ফিরে গেলেন দুদিন পরেই। দুপুরবেলা গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে মাল তোলা হল : হীরেনবাবু উঠতে গিয়ে থমকালেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিছু ফেলে এসেছেন, নিয়ে আসব?'

'না, না, আমি যাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে গেলেন তিনি, ফিরে এসে কোনোদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চাবুকের শব্দ হল। অসিত সাইকেলে উঠল—স্টেশনে যাবে সে। হিতাংশু গলা বাড়িয়ে জিগগেস করল, 'কবে আসবেন আবার?'

'আসব—তোমরা দেখো ওকে,' বলে হীরেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মনটা হু হু করে উঠল।

কী স্তব্ধ সেই দুপুরবেলা, কী-রকম ছবির মতো সুন্দর, সেই উনিশ-শো-আটাশ সনে, পুরানা পল্টনের ফাল্গুন মাসে! ঘোড়ার গাড়ি আর অসিতের সাইকেল, ছোট হতে-হতে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হল; আমি আর হিতাংশু ভেতরে এলাম। বালিশে মুখ গুঁজে মোনালিসা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

'মোনালিসা!'

'শোনো, কথা শোনো।'

'হীরেন বাবু আবার তো আসবেন—'

'এর পর ওঁকে আর যেতেই দেব না আমরা!'

'আর না—আর কেঁদো না, মোনালিসা, তোমার পায়ে পড়ি।' থামল না কান্না। আমি মেঝেতে ওর কাছে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম, ওর মাথায় হাত রেখে গুনগুন করে বলতে লাগলাম, 'আর না, আর কাঁদে না, একটু থামো, একটু চুপ করো মোনালিসা!' হঠাৎ গলা ভেঙে গিয়ে আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

একটু পরে মোনলিসা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'এই—কাঁদছ কেন? বোকা!' আমি দুহাতে মুখ ঢেকে থাকলাম, আমাকে চুলে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আবার বলল, 'পুরুষ-মানুষ—কাঁদতে লজ্জা করে না। থামো এক্ষুনি!'

আমি হাত সরিয়ে ভেজা চোখে তাকালাম। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুখে আমার বুক কেঁপে উঠল, তারপর সারাদিন ধরে একটু একটু কাঁপল, রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ভুলতে পারলাম না।

আমরা তিনজন ওকে ঘিরে রইলাম। ও যাতে ভালো থাকে, কখনো মন খারাপ না করে। হঠাৎ এক-একটা অদ্ভুত জিনিস ওর খেতে ইচ্ছা করে, অসিত শহর ঢুঁড়ে তা

জোগাড় করে আনে। দেখেই ওর ইচ্ছে চলে যাবে, জানা কথা; কবে আবার নতুন ইচ্ছে হবে সেই আশায় থাকি আমরা। আর যদি কখনো একটু খায়, খেয়ে ভালো বলে, তাহলে তো কথাই নেই—আহ্লাদে আমরা হাবুডুবু।

হীরেনবাবুর চিঠি আসতে দেরি হলেই আমরা বলি, উনি হঠাৎ এসে অবাক করে দেবেন বলেই চিঠি লিখছেন না। কথাটা ঠিক নয় জেনেও প্রতিবারেই মোনালিসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমরা চুপ করে উপভোগ করি।

হীরেনবাবু এলেন তিন মাস পরে। ততদিন ওর শরীরটা অনেকটা সেরেছে, খায়, বেড়ায়, ফেরিওলা ডেকে কাপড় কেনে, চেহারাও ভারী হয়েছে একটু। এবারে দিন দশেক থাকলেন তিনি, তারপর পুজোর সময় এসে একমাস কাটালেন।

ততদিন ওর শরীর আবার খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার আসছেন ঘন-ঘন, ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু যা শুনি তাতে মনে হয় কিছুই উপকার হচ্ছে না। কী কষ্ট জানি না, বুঝি না, শুধু চোখে দেখতে পাই;—চোখে কালি পড়েছে, দুটো কথা বললেই হাঁপিয়ে পড়ে, মুখটা এক-এক সময় নীল হয়ে যায়। আমরা কাছে কাছে ঘুরঘুর করি, শুয়ে থাকলে হাওয়া করি হাতপাখায়, কখনো একটু ভালো দেখলে হাসি-ঠাট্টায় ভোলাতে চাই—কিছুই পারি না।

একদিন আমি বললাম, 'বাবর নিয়েছিলেন হুমায়ুনের অসুখ, ও-রকম পারলে বেশ হত।'

অসিত হো-হো করে হেসে উঠল—'আর যাই পারো, ওর এ-অসুখটা তুমি নিতে পারবে না!'

লাল হয়ে বললাম, 'অসুখ না, অসুখের কষ্ট।'

হিতাংশু বলল, 'কী কষ্ট, সত্যি! সারারাত নাকি পাইচারি করে—ঘুমোতে পারে না, শুতেও নাকি কষ্ট হয়।'

অসিত বলল, 'হবে না, দেখতে কীরকম হয়েছে দেখেছ!'

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, 'কীরকম আবার হবে! সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর।'

'যত সুন্দরই হোক, এই শেষের সময়টা...'

আর-এক পরদা গলা চড়িয়ে বললাম, 'এই সময়টাই তো সবচেয়ে সুন্দর!'

সত্যিই তাই, আমার চোখে সত্যিই তা-ই দেখলাম। দিন যত কাটল, ততই ওকে আরো বেশি সুন্দর দেখলাম আমি, ওর সমস্ত শরীর এক অসহ্য সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে উঠল আমার চোখে। একদিন ওকে না-বলে পারলাম না সে-কথা। আগের বছর যেদিনে ওরা রাঁচি থেকে ফিরেছিল, যেদিন রেলগাড়ির একটা ছোট কামরায় সমস্ত স্বর্গ ধরে গিয়েছিল, ঠিক সেইরকম একটি শীতের আমেজ-লাগা দিনে হঠাৎ ও বলল, 'বিকাশ তোমার হয়েছে কী বল তো? বড্ড আজকাল তাকিয়ে থাকো আমার দিকে!'

আমি একটুও লজ্জিত না হয়ে জবাব দিলাম, 'তুমি আজকাল খুব সুন্দর হয়েছ কি না, তাই।'

'আগে বুঝি সুন্দর ছিলাম না?'

'এখনকার মতো না!'

'তাই বুঝি?' মোনালিসা ভুরু কুঁচকে বাইরে মাঠের দিকে তাকাল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সত্যি আমাকে ভালোবাসো তোমরা। কিন্তু ও-রকম করে আর তাকিয়ো না, ভারি অসুবিধে লাগে আমার। —ইস্, কী রোদ!'

আমি উঠে সামনের জানালাটা ভেজিয়ে দিলাম।

'একটু ঘুমিয়ে নিই, কেমন?'

পায়ের কাছে একখানা চাদর ছিল, ভাঁজ-করা, খুলে গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে-দিতে বললাম, 'আজকাল তুমি বেশ ভালোই আছ, না?'

'আমি তো ভালোই আছি।'

ওর মুখে দেখলাম সাহসের সঙ্গে আশা, আশার সঙ্গে ভয়, ভয়ের সঙ্গে ধৈর্য। পায়ের পাতা দুটির উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'হীরেনবাবু চলে গেলেন কেন?'

'বা রে! ওর বুঝি কাজকর্ম নেই?'

'কবে আসবেন আবার?'

'আসবেন সময়মতো।'

'কী দরকার ছিল যাবার—আমার মোটে ভালো লাগে না!'

'হয়েছে হয়েছে, আর সর্দারি করতে হবে না'—বলে পাশ ফিরে চোখ বুজল। বোজা চোখেই বলে নিল, 'আমি কিন্তু ঘুমোলাম,' এবং বলবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। আহা, রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না, কত ক্লান্তি ওর শরীরে! মনে-মনে বললাম—কার কাছে বললাম জানি না—ওর ভালো হোক, ওর ভালো হোক।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হল ও হয়তো এতক্ষণ ছটফট করছে কষ্টে, উঠে পাইচারি করছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে শেয়াল-ডাকা অন্ধকার, আর আকাশে এখনো সাত-আট ঘণ্টা রাত্রি। কেন আমি কিছু করতে পারি না, কেন এক্ষুনি যেতে পারি না ওর কাছে, কোনো অলৌকিক উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ওকে? চোখের উপর কষ্ট দেখতে হবে, কিছু করা যাবে না, এই কি মানুষের ভাগ্য? সত্যি কি আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনো উপায় নেই? ভাবতে ভাবতে ঘুম ছুটল চোখের, কবিতার লাইন মনে এল, উঠে বসতেই চোখে পড়ল ছায়া-ছায়া জোছনা ফুটেছে বাইরে, আমার জানলা দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তারা-কুটির স্বপ্নের মতো। বেশিক্ষণ তাকালাম না, লণ্ঠন জ্বেলে কেরোসিনের গন্ধে আর মশার কামড়ে বসে বসে কবিতা বানাতে লাগলাম।

রোজ হতে লাগল এ-রকম, আমার রাত্রি থেকে ঘুম প্রায় চলে গেল। আমিও জেগে আছি ওর সঙ্গে-সঙ্গে, আমি ওর প্রহরী, সকল দুঃখ থেকে আমি বাঁচাব ওকে—এ কথা ভাবতে-ভাবতে দেবতা মনে হল নিজেকে, কবিতায় এমন সুন্দর সুন্দর কথা এল যে নিজেই অবাক হলাম।

এমনি এক রাত্রে—রাত তখন দুটো প্রায়—লিখতে লিখতে হঠাৎ আমার হাত কেঁপে একটা অক্ষর বেঁকে গেল। শুনলাম বাইরে কে ডাকছে আমাকে, 'বিকাশ বিকা—শ!' একটু অপেক্ষা করলাম, আবার শুনলাম চাপা গলার ডাক। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি, ওরা দুজন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সে রাত্রে তখনও চাঁদ ওঠে নি, সারা রাত্রেও বোধ হয় ওঠে নি, অমাবস্যার কাছাকাছি রাত সেটা। আকাশ ছিল তারায় ঝকঝকে, তারই ধুলোর মতো আলোয় আমরা তিনজন দাঁড়ালাম—শীতের রাত্রি, মাঠের মধ্যে, টিপটিপ বুকে।

'কী, অসিত? হিতাংশু কী খবর?'

'আরম্ভ হয়েছে বোধ হয়,' কথা বলল হিতাংশু।

'আরম্ভ হয়েছে?'

'একতলায় শুনলাম চলাফেরা, কথাবার্তা, আর চাপা একটা গোঙানি। ঘুমের মধ্যেই যেন শুনলাম, তারপর আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। অসিতকে ডেকে তুলে তোমার কাছে এলাম। তুমি কি জেগেই ছিলে?'

আমি কথা বললাম না, তারার আলোয় দেখলাম হিতাংশুর মুখ শাদা হয়ে গেছে, আর অসিত মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। এ-কদিনে আমরাও যেন বদলে গিয়েছিলাম; হাসি, ঠাট্টা, ঘোরাঘুরি কমে গিয়েছিল আমাদের, বেশি কথা বলতাম না, আর এতদিন ধরে যে-মানুষকে নিয়ে লক্ষ কথা আমরা বলেছি, তার সম্বন্ধে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিলাম। রুদ্ধশ্বাস আমরা, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস।

আমরা বুঝলাম না যে আমরা কাঁপছি, জানলাম না যে আমরা হাঁটছি, কখন বাগানের ছোট গেট খুলে কখন এসে সিঁড়ির তলায় দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই আমরা কোনো শব্দ করি নি, কোনো কথাও বলি নি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দে-সাহেব টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন, যেন আমাদেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। নিচুগলায় বললেন, 'অসিত, একবার যাও তো সাইকেলটা নিয়ে ডক্টর মুখার্জির কাছে—একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তাঁকে।'

অন্ধকারে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল অসিত। আমি আর হিতাংশু সিঁড়ির উপরেই বসে পড়লাম। একটা কান্না, চাপা একটানা, আমাদের পিঠ ফুঁড়ে বুকের মধ্যে ঢুকল, তার যেন আওয়াজ নেই, শুধু কষ্ট আছে, যেন পৃথিবীর প্রাণে আঘাত দিয়েছে কেউ, পৃথিবীর বুক থেকে এই কান্না উঠছে, তাই কোনোদিন থামবে না।

ওকে চোখে দেখতে পারি না আমরা, দূর থেকেও না; ও-ঘরে যেতে পারি না আমরা, ঘরের কাছেও না। শুধু বাইরে বসে থাকতে পারি, শীতে, অন্ধকারে, না-জেগে, না-ঘুমিয়ে, আকাশের সামনে, অদৃষ্টের মুখোমুখি।

ডাক্তারের আনাগোনা শুরু হল, চলল বাকি রাত ভরে, চলল তার পরের দিন। ভোর হতেই চড়া মাশুলের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম হীরেনবাবুকে—মনে মনে ভাবলাম, টেলিগ্রাম যত দ্রুতই ছুটে যাক, তার চেয়েও দ্রুতবেগে ছুটে আসুক হীরেনবাবুর মন, কাল বিকেলের আগে তিনি পৌঁছতে পারবেন না কিছুতেই—কী অসহায় মানুষ, কী নিরুপায়! ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, ইনজেকশন, পরিশ্রম, প্রার্থনা;—তবু অসহায়, তবু মানুষ অসহায়—কী হচ্ছে, কী হল, কী হবে, এসব প্রশ্নের উত্তর নেই কারো চোখে, ডাক্তারের মুখ পাথরের মতো, ওর মা-বাবার মুখে সংক্ষিপ্ত ফরমাশ ছাড়া আর-কোনো কথা নেই, মাসিমা আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি পর্যন্ত করেন না, আর দে-সাহেবের পরিপাটি চেহারাটির তলায় একজন কুঁকড়ানো বুড়োমানুষ যে লুকিয়ে ছিল তা কে জানত! কে জানত আকাশের নীল নরম ঘোমটার তলায় এই কান্না লুকিয়ে আছে! আর আমাদের কি আর কিছু নেই, আর কিছু করবার নেই, শুধু কান পেতে এই কান্না শোনা ছাড়া?

দুপুরের আগেই বিকেল হয়ে গেল সেদিন, বিকেলের আগেই অন্ধকার। তারপর, রাত যখন একটু ভারি হয়েছে, হঠাৎ যেন পৃথিবীর বুক চিরে চিৎকার উঠল একটা; উঠল, পড়ল, আবার উঠল আকাশের দিকে; আকাশ চুপ, তারাদের নড়চড় হল না; আবার উঠল চিৎকার, যেন প্রতিমার সামনে ছাগশিশুর আর্তরব, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিরামহীন। আমরা ছুটে চলে গেলাম বাইরে, মাঠের মধ্যে, কিন্তু যত দূর যাই সে-শব্দ সঙ্গে চলে আমাদের,

মাতা পৃথিবীর আদিম কান্না এটা, এ থেকে নিস্তার কোথায়?

ফিরে এলাম। ভিতরে আলো, ব্যস্ততার ঢেউয়ের পর ঢেউ, ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারের মোটা গলা, আর বাইরে অফুরন্ত তারা, অসীম অন্ধকার, অপরূপ রাত্রি, কিন্তু পৃথিবীর কান্না তো থামে না।

যে-তারা ছিল মাথার উপরে নেমে এল পশ্চিমে, যে-তারা ছিল চোখের বাইরে উঠে এল দিগন্তের উপরে, পুবের কালো ফিকে হল, ছোট ছোট অনেক তারা মুছে গিয়ে মস্ত সবুজ একলা একটি তারা জ্বলজ্বল করতে লাগল সেখানে। এই সেই অপার্থিব মুহূর্ত, সেই অলৌকিক লগ্ন, যখন আমি জেগে উঠে বাইরে এসেছিলাম ওর বিয়ের দিন, যখন আমি ওকে পেয়েছিলাম মৃত্যুর হাত থেকে, অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে একটিমাত্র ভেসে চলা আলো-জ্বলা নৌকায়। অন্তত একমুহূর্তের জন্য সেদিন সে আমার হয়েছিল, আজ কি আবার এল সেই মুহূর্ত?

অসিত ফিসফিস করে বলল, 'কী হল?'

হিতাংশু বলল, 'কই, না!'

'সব যেন চুপ?'

'তাই তো।'

'যাব একবার ভেতরে?' অসিত উঠে দাঁড়াল, কিন্তু গেল না। অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু আর কোনো শব্দ নেই, সব স্তব্ধ, তারপর হঠাৎ দেখি দে-সাহেব আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভোরের প্রথম ছাইরঙা আলোয় দেখলাম তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠল, এমন স্থির হয়ে আমরা তাকিয়েছিলাম আর এমন স্তব্ধ চারদিক যে তাঁর কথাটা আমরা কানে না-শুনে যেন চোখ দিয়ে দেখলাম :

'এসো তোমরা, ওকে দেখবে।'

অসিত আর হিতাংশুই সব করল, রাশি রাশি ফুল নিয়ে এল কোথা থেকে, আরো কত কিছু, বেলা দুটো পর্যন্ত শুধু সাজাল শুধু সাজাল, তারপর নিয়ে যাবার সময় সকলের আগে রইল ওরা দুজন। আরো অনেকে এল কাঁধ দিতে, শুধু আমি বেঁটে বলে বাদ পড়লাম, পিছনে পিছনে হেঁটে চললাম একা-একা। ঠিক একা-একাও নয়, কারণ ততক্ষণ হীরেনবাবু এসে পৌঁছেছেন, গাড়ির কাপড়ে জুতো-ছাড়া পায়ে তিনিও চললেন আমার পাশে পাশে।

হীরেনবাবু পরের বছর আবার বিয়ে করলেন, দে-সাহেব চলে গেলেন বদলি হয়ে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করল ওঁদের কথা, তারপর তারা-কুটিরের একতলায় অন্য ভাড়াটে এল, পুরানা পল্টনে আরও অনেক বাড়ি উঠল, ইলেকট্রিক আলো জ্বলল। অসিত স্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিল তিনসুকিয়ায়, ছ-মাসের মধ্যে কী একটা অসুখ করে হঠাৎ মরে গেল। হিতাংশু এম. এস-সি পাশ করে জার্মানিতে গেল পড়তে আর ফিরল না, সেখানকারই একটা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতল। এখন এই যুদ্ধের পরে কেমন আছে, কোথায় আছে কে জানে। আর আমি—আমি এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয়, উনিশ-শো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে একটু হাওয়া—সেই মেঘে ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুপুর, সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি, সেই—তুমি! মোনালিসা, আমি ছাড়া আর কে তোমাকে মনে রেখেছে!

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলা ভাষা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র